ISBN 81-237-2983-9

2000 (শক 1921)

মূল্য : 14.00 টাকা
Bholu Aur Golu *(Bangla)*
নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত

সূচীপত্র



এ কেমন বেঁচে থাকা?

এ এক ছোট্ট ভালুকের কথা। সার্কাসের ভালুক। সব সময়ই যেন আনমনা, উদাস। কোনো বন্ধু নেই, কারো সঙ্গে খেলা করার উপায়ও নেই। বন্ধুত্ব করবেই বা কার সঙ্গে! সার্কাস-কোম্পানি তো ঘুরে বেড়ায় এখানে ওখানে। এক-আধ মাসের বেশি কোথাও থাকে না। এক শহরের পাট শেষ হলে আরেক শহরে যাওয়া। যাওয়ার সময়টা এলে ছোট্ট ভালুক বেজায় খুশি। তখন অবশ্য ওকে খাঁচায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু তাতেও ওর খারাপ লাগে না। হাতি ঘোড়া ছাগল বাঘের সঙ্গে ও তখন মালগাড়িতে উঠে পড়ে।

এ হলো ছোট্ট ভালুকের খুশির দিন। ইঞ্জিন ভোঁ দেয়, আর তার পরেই যেন বুক ভ'রে দম নিয়ে প্রচণ্ড এক টান, কামরাগুলো হড়হড়িয়ে এগিয়ে যায়। এক খাঁচার সঙ্গে আরেক খাঁচার ধাক্কায় সে কী আওয়াজ! কখনো কখনো ভয় করে : পড়ে যাবে না তো? গাড়ি চলতে শুরু করে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে গায়ে। আস্তে আস্তে ভয় কাটে। বাড়িঘর, লোকজন, পশুপাখি, শহরগ্রাম, সব পড়ে থাকে পেছনে। বড় মজা! চারিদিকে তাকিয়ে দেখে খাঁচার ভেতর থেকে। নদীনালা, গাছ-পাহাড় : এইসব দেখতে বেশি ভালো লাগে। বাড়ির কথাও মনে পড়ে। ওর বাড়িও তো ছিলো এমনই এক পাহাড়ের কোলে। সেখানে কতো নদীনালা, গাছপালা। চোখে ভ'রে আসে জলে। যতক্ষণ না রেলগাড়ি ওকে নিয়ে পাহাড়-পর্বত গাছপালা ছাড়িয়ে দূরে চলে যায়, কান্না আর থামে না ওর।

এ চলা শেষ হয় ওর পছন্দ নয়। নামতেই নাকে পরিয়ে দেয় দড়ি, মুখে বেঁধে দেয় পটি। সার্কাস-চত্বরের এ কোণে ওর খুঁটি, বেশির ভাগ সময় তাতেই বাঁধা। সার্কাসের বিশাল তাঁবু, পশুদের রঙচটা খাঁচা, আর টিনের চাদরের খুপরি ছাড়া চোখে পড়ে না আর কিছুই। ও ভাবে, এ কি একটা জীবন! খেলা নেই, ধুলো নেই,

সর্বদা এক জায়গায় বাঁধা থাকো। আরও মনমরা হয়ে যায়। দিনের পর দিন চুপচাপ পড়ে থাকে। কারো সঙ্গে কথা নেই, খেলা নেই। এমন কি, খেতেও ভালো লাগে না।

সব পশুরাই ওর ব্যাপার জানে। তারা বোঝায়, 'দ্যাখ্ ভোলু, উদাস থেকে হবেটা কি? তোকে এখানেই থাকতে হবে। পুরোনো কথা ভুলে যা। আর তুই ফিরে যেতে পারবি না। খেয়ে-দেয়ে, আরাম করে পড়ে থাক।'

ছোট্ট ভালুকের কিন্তু এ জীবন পছন্দ নয়। ও বন্দী, আর ছড়ির ইশারায় ওকে নাচতে হয়, কখনো জোকারদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে হয়, কখনো নকল কুস্তি। একটু ভুল হলেই চাবুকের মার। কখনো সকলের সামনে, কখনো বা পরে।

প্রথম-প্রথম রাগ হতো। তাতে মার পড়তো বেশি। এখন ও চুপচাপ মার খায়, চুপচাপ কাঁদে।

তবে মোটরসাইকেল চালাতে ওর বড়ো আনন্দ। মোটর সাইকেলে বসলেই ওর মন খুশিতে নেচে ওঠে। তার ভটভট আওয়াজ ওর কানে যেন মিষ্টি গানের সুর।



এমন নয় যে মোটরসাইকেল চালাতে ও আপনা আপনিই শিখে গেল। এর জন্যে অনেক মার খেতে হয়েছে। আগে তো সার্কাসের গোল মাঠে চক্কর কাটতে গিয়ে বারবার পড়ে যেত। এখনও মোটর সাইকেল স্টার্ট করতে শেখেনি। তবে ইঞ্জিন একবার চালু হয়ে গেলে ও নির্ভয়ে চালিয়ে নেয়। ভাবে, কী না ভালো হতো যদি ও মোটরসাইকেল তাঁবুর বাইরে নিয়ে যেতে পারতো, খোলা আকাশের নীচে, নদীনালা ছাড়িয়ে পাহাড়ের দিকে। ভাবে, যদি রেলগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিত!

যখন সার্কাসের দল এক শহর ছেড়ে অন্য শহরের দিকে যেতে থাকে, তখন ওর মাথায় এই সব চিন্তা। কী ভালোই না হতো যদি রিংমাস্টারের অনুমতি নিয়ে ও রেলগাড়ির পাশে-পাশে মোটর সাইকেল যেত! কতো মজা হতো তাতে। রেলগাড়ি বোঝাই সঙ্গী সাথীদের ও হাত নেড়ে নেড়ে টা-টা করতো। বন্ধুরা ওকে দেখে হাততালি দিত।

ওর মোটরসাইকেল-চালানো তো অন্য পশুরা অবাক হয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে। ওদের মধ্যে কেউ মোটরসাইকেল চালাতে জানে না। কিন্তু হায়, এ-সব তো কল্পনা। এমন স্বপ্ন ছোট্ট ভালুক প্রায়ই দেখে। ওর তো মাঝেমাঝে মনে হয় রিংমাস্টার যদি ওকে নতুন মোটরসাইকেল কিনে দেয় ও তাতে স্টার্টও দিয়ে নেবে। রিংমাস্টারের কী সুন্দর নিজের মোটর সাইকেল আছে! কিন্তু রিংমাস্টার বড়ো নিষ্ঠুর। ওকে দেখে সব পশুর হৃৎকম্প। তাই বেচারা ভালুকের সাহস নেই ওকে কিছু বলে।



ভোলুর রাগ

সেদিন খুঁটিতে-বাঁধা ছোট্ট ভালুক খাঁচার বাইরে চুপচাপ শুয়ে ছিল। পাশেই ছিল হাতির দল। এমন সময় সে একটি ছেলেকে দেখতে পেল। ন'দশ বছরের একটি ছেলে নিশ্চিন্ত মনে নিজের হাতে হাতিদের সবুজ ঘাস খাওয়াচ্ছিল। হাতি মাঝে মাঝে শুঁড় দিয়ে ওকে আদর করছিল। ভালুক ভাবলো, ছেলেটা কে রে! প্রথম দেখলো ওকে। হয়তো মাহুতের ছেলে। মনে হয় মাহুতের সঙ্গেই এসেছে। হয়তো ওর গ্রাম থেকে এই প্রথম আসা। তবু হাতিদের একটুও ভয় পায় না! ভালুক ভাবে, হাতিদের সঙ্গে ওর নিশ্চয়ই আগে থেকে ভাব।

ছেলেটিও দেখতে পেল ভালুককে। বেজায় খুশি ও। প্রথম এত ছোট ভালুক দেখলো। দৌড়ে এলো ভালুকের কাছে। ভালুক ভাবতেই পারেনি ও এমনভাবে হঠাৎ আসবে। ঘাবড়ে ও চোখ বন্ধ করে নেয়। যেমন করে হাতিদের আদর করছিলো ছেলেটি, ঠিক তেমনিভাবেই ও ভালুককেও আদর করতে চাইল। ভালুকের কিন্তু এসব পছন্দ নয়। আরে বাবা, এই তো প্রথম দেখা! এমনিতেই ওর আজ মন ভালো নেই, তার ওপর আবার এই এক উটকো ঝামেলা! রাগে গরগর করে উঠে ও চালালো থাবা।

চিৎকার করে ছেলেটা পালালো। ভয়ে কেঁদে উঠলো তারস্বরে। পশুর দল চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো। দৌড়ে এসে মাহুত ছেলেকে কোলে তুলে নিলো। দেখলো, থাবার নখে ওর হাতে একটু ছড়ে গেছে। মাহুত রেগে ভালুকের দিকে তাকালো, কিন্তু কিছু বললো না।

মাহুত অনেকক্ষণ ধরে ছেলেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কোনোরকমে চুপ করালো। ছেলে এবার গেল রেগে। ছড়ি নিয়ে ভালুককে মারতে দৌড়লো। বাবা দৌড়ে গিয়ে ছেলেকে ধরে ফেলে ওর হাত থেকে ছড়ি কেড়ে নিলো।


CIRCUS

'বাবা, বড়ো পাজি এই ভালুকটা; আমি তো ওকে আদর করছিলাম আর ও আমাকে থাবা দিয়ে মারলো।'

বাবা ওকে বোঝায়, 'না রে, এ বেচারাও তো তোরই মতো বাচ্চা; হয়তো ভয় পেয়েছে। ভাবতো কোথায় ওর মা-বাব আর কোথায় ও। বড়ো দুঃখী, কারো সঙ্গে কথা কয় না।'

ছেলের রাগ পড়েনি দেখে মাহুত বললো,'আচ্ছা,তুই একটা জিনিস জানিস?' ও বাপের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

'তুই ওর নাম জানিস?'

ছেলে চুপ।

'তুই জানিস না; তাই না? শোন, আমি বলছি। তুই হলি গোলু, ঠিক তো? আর ভালুকটার নাম ভোলু।' এই বলে মাহুত হাসতে লাগলো। ছেলেও না হেসে পারে না।

'মজার ব্যাপার, না রে? একজন ভোলু, আরেকজন গোলু। এরই ওপর আমি তোকে একটা ছড়া শোনাতে পারি। শুনবি?'

গোলু কিছু বলার আগেই শুরু হল ছড়া :

একটা ভোলু একটা গোলু
ভোলুর কাছে চললো গোলু
ভোলু তো আগে রেগেই ছিলো
গোলু নয় মোটেই ভালো
রাগের চোটে ঘড়ঘড় করে
থাবার চাঁটি মারলো জোরে।

'কেমন?'— দুজনে মিলে খুব হাসলো।

সেদিন থেকে ওর বাবার সঙ্গে গোলু রোজ আসে। কিছুক্ষণ ভোলুর কাছে দাঁড়ায়। ওকে দ্যাখে আর চলে যায়। ভোলুর সঙ্গে কথা বলে না। ভোলুও ওকে কিছু বলে না। একজন আরেকজনের দিকে চেয়ে থাকে। ভোলু নিজের দোষ বুঝতে পারে। আস্তে আস্তে ওদের বিরোধ কমে আসতে থাকে। ভোলু চায় গোলুর সঙ্গে কথা বলে। গোলুও চায়, কিন্তু ওর ভয় ভোলুর রাগকে।

এবার ভোলু রোজ বসে থাকে গোলু কখন আসবে। গোলু আসে, দূর থেকে ভোলুকে দ্যাখে আর চলে যায়। ভোলু ওকে দেখতে থাকে যতক্ষণ দেখা যায়। গোলু কখনও হাতিকে খাওয়ায়, কখনও তার শুঁড় নিয়ে খেলা করে, কখনও পা জড়িয়ে ধরে। হাতি শুঁড় তুলে ওকে কাছে ডাকে, আদর করে। বড় হাতি ঐরাবত ওকে শুঁড়

দিয়ে পিঠে তুলে নেয় আর ওদের ঘেরার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। গোলু হাতির পিঠে বসে কখনও খুশিতে চেঁচিয়ে ওঠে, কখনও বা হাত নেড়ে-নেড়ে ওর বাবাকে ডাকে।

ভোলুর আজকাল গোলুকে খুব ভালো লাগে। ওর সঙ্গে কথা বলতেই হবে এবার, কিন্তু বুঝতে পারে না কিভাবে শুরু করবে। ভাবতে ভাবতে মাথায় একদিন একটা বুদ্ধি এলো। পরদিন গোলু যখন আসছে, ভোলু ডিগবাজি খেতে লাগলো। তারপর দুপায়ের ভরে দাঁড়িয়ে তালে-তালে নাচতে লাগলো। ওর পায়ের ঘুঙুরে ঝমঝম আওয়াজ। গোলু এমন নাচ কখনও দ্যাখেনি। আর থাকতে না-পেরে ও হাততালি দিয়ে উঠলো : 'সাবাস ভোলু!'

সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখছিলো ভোলুর নাচ। ওরা অবাক হয়ে গেল, ভোলুর হলোটা কী আজ! ও আজ এত খুশি কেন? এতে অবশ্য সকলেরই আনন্দ। সব্বাই নিজের নিজের জায়গা থেকে নাচ উপভোগ করলো।

হাতিরা বললো, 'সাবাস ভোলু! দারুণ! অপূর্ব!' বাঘও না হেসে পারে না। গর্জন করে উঠলো, ' বা রে ভোলু , বাঃ, কামাল করলি আজ! তুই তো দেখি শিল্পী রে!' ঘোড়ারা একস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, "চিঁহিঁ চিঁহিঁ।' এমন কি ছাগলরাও তারিফ না করে পারে না। ব্যা-ব্যা করে বললো, 'ভালো নাচিস তো; খুব ভালো।'

দেখাদেখি ছোট হাতির মনে জাগে নাচার ইচ্ছে। ও নাচবে বলে মাথা দোলাতে শুরু করেছে কি, সব জন্তুরা বলে উঠল : 'আরে ছোটু, থাম ভাই! তোর নাচ খুব দেখেছি আমরা।' ছোটহাতি দুঃখ পায়, কিন্তু কীই বা করা! থামতেই হয়। গোলু তো ভোলুর নাচে খুশিতে ডগমগ। বলে, 'আর একবার নাচ দেখা তো!'

ভোলু তো এটাই চাইছিলো। সঙ্গে সঙ্গে আবার নাচ! আবার গোলুর ফরমায়েস, 'আরও একবার নাচো'।

ভোলু খুশি। যাক, গোলুর পছন্দ হয়েছে নাচ। জীবনে এই প্রথমবার ভোলুর নিজের নাচে আনন্দ। আগে তো সে নাচতো রিংমাস্টারের চাবুকের ইশারায়। তখন নাচ দেখে দর্শকরা —যাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছোটছোট ছেলেমেয়ে—তারিফ করলেও ওর মন যে খুব একটা খুশিতে নেচে উঠতো, তা নয়। লাঠির ভয়ে নাচা কি একটা নাচা? কিন্তু আজ যে নিজের ইচ্ছেয় নেচেছে। আজ যারা তার নাচ দেখেছে তাদের মনও কিন্তু খুশিতে নেচে উঠেছে।

হাতির পিঠে

এভাবেই দুজনের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। গোলু যখন খুশি ভোলুর কাছে চলে আসে। দুজনে খেলে। এতে হাতি মাঝে মাঝে রেগে যায়। বিরক্তিতে চ্যাঁচালে গোলু দৌড়ে গিয়ে ওদের শুঁড়ে হাত বোলায়, তাজা ঘাস খাওয়ায়। বড়ো হাতির পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। হাতির রাগ পড়লেই আবার ছুটে চলে আসে। যখন হাতির পিঠে চড়ে ঘোরে, ভোলু দুপায়ে দাঁড়িয়ে মনের আনন্দে ওকে দেখে। খুশিতে হাততালি দেয়, কখনও বা লাফাতে থাকে। গোলুর খারাপ লাগে যে ভোলু সঙ্গে নেই। ভাবে, ভোলুও হাতির পিঠে চড়লে ক্ষতি কি?

গোলু মনের কথা হাতিদের বলে। ওপর দিকে শুঁড় তুলে ওরা জানায় ওরা রাজি। হবে নাই বা কেন? গোলু আর ভোলু দুজনে মিলে বসলেও ওদের একটুও ভারি লাগার কথা নয়। তাছাড়া ওরা তো গোলুকে ছাড়তে চায় না। ওরা চায় গোলু ওদের সঙ্গে খেলুক। ভোলু এসে গেলে সবাই মিলে একসঙ্গে খেলা যাবে।

পরদিন গোলু চুপিচুপি ভোলুর বাঁধন খুলে দিল। আর দুজনে হাতিদের সামনে এসে দাঁড়ালো। হাতিরা তো খুব খুশি। সবাই বলে উঠলো, আয় আয়। ঐরাবত তো তক্ষুণি মাটিতে বসে পড়লো। কিন্তু ও এতো বড়ো হাতি যে বসলেও গোলুর পক্ষে সহজ নয় যে ওর পিঠে চড়ে। ভোলু চট করে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাতির কাছে ঘেঁসে দাঁড়ালো, আর ভোলুর পিঠে চড়ে গোলু সহজেই হাতির পিঠে উঠে বসলো।

এবার ভোলু চড়ে কি করে? ঐরাবতের পিঠে চড়া সহজ কাজ নয়। যেই চড়তে যায় ঐরাবতও নড়ে চড়ে ওঠে। 'এ কি করছো?'

হাতি নড়া বন্ধ করে বলে, 'ঠিক আছে, শিগগির চড়।'

ভোলু আবার যেই চড়তে যায় হাতি আবার নড়ে ওঠে।

ভোলুর হয় রাগ। বলে, 'তুমি চাও না আমি তোমার পিঠে বসি। যেই চড়তে যাচ্ছি তুমি নড়ে উঠছো। যাও, আমি চড়ব না, আমি চললাম।'

হাতি বলে,'দ্যাখো মজা! আরে, গড়বড় আমি করছি, না তুই?'

এতো বড়ো বড়ো নখ রেখেছিস যে যেই চড়তে যাচ্ছিস আমার কাতুকুতু লাগছে।

ওদিকে গোলু বুঝতে পারছে না হচ্ছেটা কি! ওর সন্দেহ, দুটোতে ঝগড়া শুরু করে দেয়নি তো? আয় না রে বাবা! দেরি করছিস কেন? ও নিচে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে ভোলুকে টানতে থাকে।

ভোলু কিন্তু বেশ ভারি। সহজে টানা যায় না। গোলু প্রাণপণ টানছে, ভোলুও চড়ার চেষ্টায় হাত-পা ছুঁড়ছে। এতে হাতির আবার সুড়সুড়ি লাগে। তবু হাতি যতটা সম্ভব নড়াচড়া বন্ধ রাখে। কিন্তু ভোলু তো ওপরে চড়ার জন্যে খুবই কসরৎ করে চলেছে। এতে হাতির এত সুড়সুড়ি লাগে যে ও আর নিজেকে সামলাতে পারে না। এত জোরে নড়ে ওঠে যে ভোলু তো ভোলু, গোলুও নিজেকে সামলাতে না-পেরে সড়সড় করে হাতির পিঠ বেয়ে নেমে এসে ভোলুর সঙ্গে মাটিতে ধপাস করে পড়ে গেল। সবাই বলে ওঠে, কি হলো? কি হলো? ভোলু-গোলুর চোট লাগেনি তো? ভাগ্য ভাল, ওখানে বেশ ঘাস, কারো চোট লাগেনি। গোলু আর ভোলু রেগেমেগে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। এই না দেখে হাতিদের সে কি হাসি!

ওসবের দিকে কান না দিয়ে গোলু আবার হাতির পিঠে চড়ার চেষ্টা করে। ভোলু পিঠ পেতে দেয়। পিঠে চড়তে যাবে, এমন সময় গোলুর মনে হলো সে হাওয়ায় ভাসছে। আসলে হস্তিনীর মনে হয়েছে এইসব লাফালাফি করতে গিয়ে গোলু না আবার পড়ে যায়। তাই ও শুঁড় দিয়ে গোলুকে তুলে হাতির পিঠে বসিয়ে দেয়, এবং ঘটনাটা ঘটে যায় গোলু কিছু বোঝার আগেই।

ভোলু ওদিকে উবু হয়ে বসে ভাবছে কখন গোলু চড়বে। গোলুর আসলে হল টা কি? এত দেরি হচ্ছে কেন? যেই ফিরে তাকিয়ে দেখতে যাবে, আমনি কে যেন সাঁ করে ওকে ওপরে তুলে নিলো। বেসামাল ভাবটা কাটতে-না-কাটতে দেখে যে ও হাতির পিঠে ঠিক গোলুর পিছনে বসে রয়েছে।

হাতিদের আবার জোর হাসি শুরু হয়ে গেল। হেসে বাঁচে না, কিন্তু ভোলু ঘাবড়ে গিয়ে ভাবে হল টা কী! আসলে দুটো হাতি দুদিক থেকে শুঁড়ে তুলে ওদের ঐরাবতের পিঠে বসিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ভোলুও হেসে ফেলেছে।

ঐরাবত যখন উঠে দাঁড়াচ্ছে, ভোলুর সে কী ভয়! গোলুকে আঁকড়ে ধরেছে। গোলু বোঝায়, 'আরে ঘাবড়াস না, কিছু হবে না। সোজা হয়ে বসে থাক।'



দুজনকে পিঠে বসিয়ে ঐরাবত খানিকটা চক্কর লাগায়। দৃশ্যটা এতই অদ্ভুত যে সব পশুরাই হেসে কুটোপাটি। মাহুত চ্যাঁচামেচি শুনে দৌড়ে আসে। আরো কিছু কর্মচারী জড়ো হয়। ভাগ্যিস রিংমাস্টার তখন গভীর ঘুমে।

এক ধমক দিয়ে মাহুত হাতিকে বসায়। গোলু-ভোলু নিচে নেমে আসে। মাহুত ওদেরও খুব বকুনি দেয়। ভোলু এক দৌড়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ে। চৌকিদার ওকে খুঁটিতে বেঁধে দেয়।

এদিকে তাঁবুতে ফিরে মাহুত ছেলেকে বোঝায়,'দ্যাখ্, তুই যদি এইসব করিস আমার চাকরি যাবে। এ সব করিস না আর ।ভাব একবার, ভালুকটা যদি পড়ে যেত! নতুন ভালুক আসতো কোথা থেকে? ভালুককে বশ মানানো, খেলা শেখানো, এ সব সহজ কাজ নয়। রিংমাস্টার তো আমাকে মেরেই ফেলতো, বুঝে দ্যাখ, একবার।' গোলু চুপচাপ সব শোনে।

এই ঘটনার পর গোলু আর ভোলুর বন্ধুত্ব কমবে কি, বরং আরও বেড়ে গেল। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে এমন কান্ড ওরা আর করেনি।



ঘুড়ি ওড়ানো

আজ গোলু দুপুরবেলাতেই দৌড়ে এসেছে। রোদ বেশ চড়া। ভোলু বাঘের খাঁচার ছায়ায় ঝিমুচ্ছে। গোলু ওকে এক ধাক্কা দিয়ে বললো,'ঘুমোচ্ছিস?' দ্যাখ কী এনেছি।' দারুণ খুশিতে আজ গোলুর চোখ ঝলমল করছে।

ভোলু তো এমন জিনিস কখনো দ্যাখেনি। বুঝতেই পারছে না এটা কী হতে পারে। ও মানুষের ভাষা বোঝে কিন্তু বলতে পারে না। কুঁ কুঁ শব্দ করে উঠলো, যার মানে দাঁড়ায়, তুই-ই বল্ না এটা কী!

মুচকি হেসে গোলু বলে 'একে বলে ঘুড়ি। বাবা এনেছে। ওড়াবো'। ভোলু এখনও বুঝছে না এই ঘুড়ি জিনিসটা কী। গোলু পরিষ্কার জায়গায় ঘুড়িটা রাখলো। তারপর লাটায়ের সুতোয় ঘুড়িটা বেঁধে লাটাইটাকে নিয়ে দূরে চলে গেল। সুতোয় যেই টান পড়লো এক ঝটকায় ঘুড়ি উড়ালো আকাশে। ঘুড়ি আকাশে যত ওপরে যায়, ভোলু খুশিতে তত নাচতে থাকে। অনেক ওপরে গিয়ে ঘুড়ি যখন এক জায়গায় স্থির, গোলু ভোলুকে বললো,' তুই ওড়াবি?'

ভোলু ঘাবড়ে গেল। গোলু চায় ভোলু সুতো ধরুক। ভোলু ভয়ে পিছু হটে। বলতে চায়, আমি পারব না, কিন্তু গোলু মানবে না। 'ভয় পাস না, কী এমন শক্ত কাজ? তুই শুধু ধরে থাক৷ কোনও ভয় নেই ;আমি তো এখানেই আছি।' ওকে বুঝিয়ে দিলো কেমন করে সুতো ধরতে হয়, দরকার পড়লে কেমন করে একটু টানতে হয় বা ঢিলা দিতে হয়।

ঘুড়ি উড়ছে আর তাতে গোলুর কী মজা! খুশিতে হাততালি দিচ্ছে। কিছুক্ষণ তো ঘুড়ি ঠিক উড়লো, তারপর হঠাৎ কী যে হল! ঘুড়ি একদিকে ঝুঁকে পড়লো। ভোলু চিৎকার করে উঠলো, আর গোলু সুতোয় সামাল-টান দিতে দিতেও ঘুড়ি



অনেকটা গোঁত্তা খেয়ে নেমে এলো। গোলু অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু সামলাতে পারলো না। ঘুড়িটা সামনের ইলেকট্রিক তারে গিয়ে পড়লো।

ঘুড়ি তারে জড়িয়ে গেছে দেখে ভোলু হতাশ। গোলু ওটাকে তার থেকে ছাড়াবার অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু এমনই জড়িয়েছে তারে যে বার করাই গেল না। শেষে সুতো ছিঁড়লো আর ঘুড়ি তারে ঝুলে রইলো।

ভোলুর বড় দুঃখ হল। কী সুন্দর জিনিসটা ছিলো। পাখির মতো উড়ছিলো। ওরই দোষে হাত থেকে বেরিয়ে গেল। এখন ইলকেট্রিক পোলের ওপর গিয়ে বসেছে। ভোলু ভাবছিলো, ঘুড়িও বুঝি একরকম পাখি। ভাবতেই পারেনি এই দুনিয়ায় এমন জিনিসও আছে যা মানুষ ইশারা করলে ডানা না থকলেও উড়তে পারে। যা আকাশে ওড়ে, ভোলু জানে তাই-ই পাখি।

ভোলু ভাবলো, ডাকলে যদি আসে! 'বাও-বাও-বাও', চেঁচিয়ে বলে 'শোন রে ঘুড়ি! ছেলেটা বড়ো ভালো। রিংমাস্টারের মতো নয় যে কথায় কথায় মারপিট করবে। ফিরে আসছিস না কেন? খাম্বায় ঝুলে থেকে কী লাভ? চলে আয়। ছেলেটা আমার বন্ধু। তোকে আদর করবে।'

কিন্তু ঘুড়ি তো শুনতে পায় না। লটকেই থাকে। নিরাশ হয়ে ভোলু চুপ করে থাকে।

খারাপ তো গোলুরও লাগছিল, কিন্তু অমন মনমরা হয়ে হাল ছেড়ে দেয়নি। ওর মাথাতেই ঢুকছে না ভোলু অতো চ্যাঁচাচ্ছে কেন। তাড়াতাড়ি সুতো গুটিয়ে, কপালের ঘাম মুছে, ভোলুর কাছে এসে বললো, 'ঠিক আছে, বাবা আমার জন্যে আরও ঘুড়ি নিয়ে আসবে।'

ভোলুর চোখে জল। গোলু হেসে বলে, 'তুই কাঁদছিস কেন রে? এমন তো হয়ই। ঘুড়ি উড়ছিলো, কোথাও ফেঁসে গেছে। এতে কে-ই বা কি করতে পারে? আর ঘুড়ি তো আটকাবেই। আমার হাতেও হতে পারতো।' ভোলুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললো,'চল্ ফুটবল খেলি'। কিছুক্ষণ দুজনের ফুটবল খেলা চললো। ভোলুর কিন্তু খেলা ভালো লাগলো না। তাছাড়া সার্কাসের সময় হয়ে এসেছে। ওকে ভেতরে যেতে হল।

রিংমাস্টারের চাবুক

সার্কাসের সো চলাকালীন ভোলু তাঁবুর ভেতরেই থাকে। বাইরে কেউ থাকে না, কিছু করারও থাকে না। সেদিনও যথারীতি তাঁবুতে গেল।

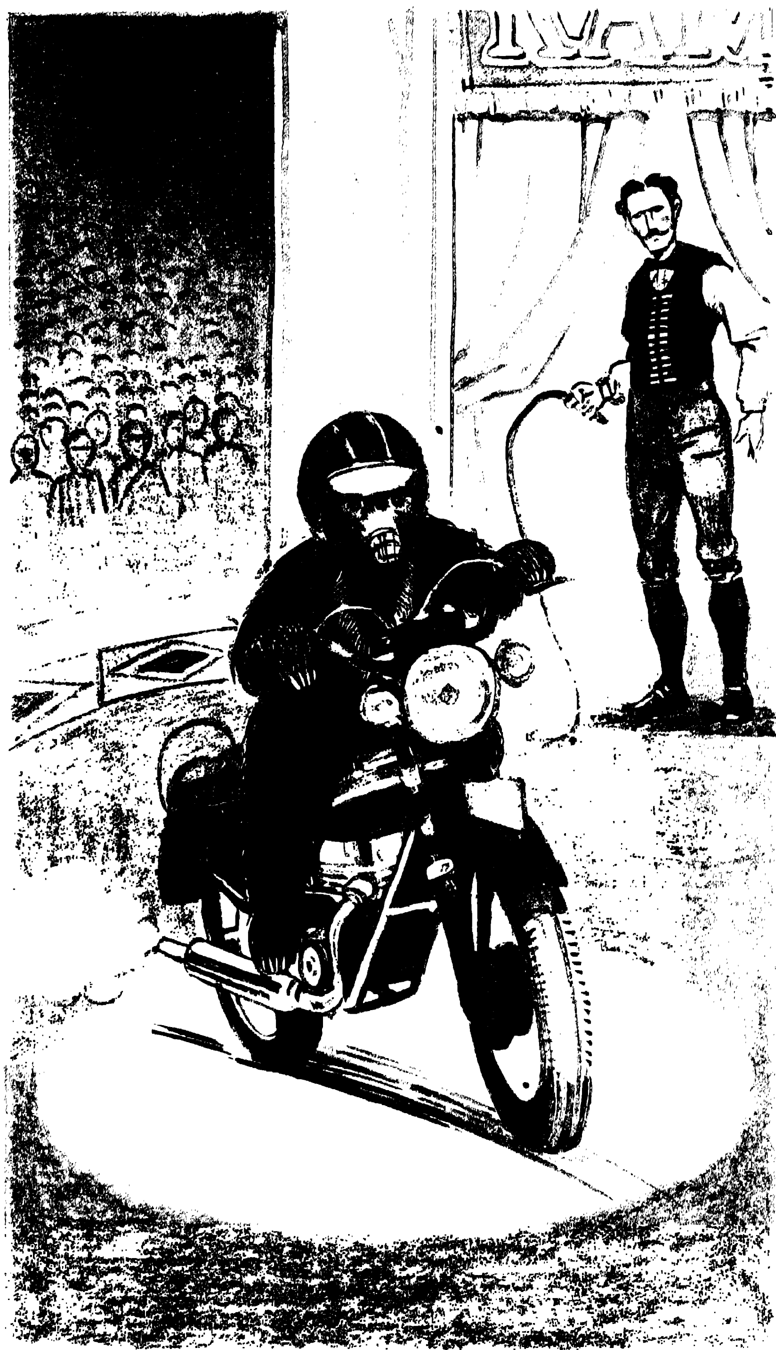
মন আজ বড় চঞ্চল। কিছু ভালো লাগছে না। সার্কাসের শো'য় ফুটবলটা কোনোরকমে খেললো। এরপর মোটরসাইকেল চালানো। রোজকার মতো ওকে মোটর সাইকেলে বসিয়ে দিলো আর ও চক্কর কাটতে লাগলো। ছোটছোট ছেলেমেয়েরা ওকে দেখে খুশীতে নেচে ওঠে, হাততালি দেয়; আর ভোলুর হঠাৎ মনে পড়ে ঘুড়ি যখন আকাশে উড়ছিলো ও এমনি করেই হাততালি দিচ্ছিলো। শুধু তাই নয়, ও নিজে যখন ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলো গোলুও এমনি করেই খুশিতে নেচে উঠে ছিলো।

হঠাৎ ভোলুর মনে হল ঘুড়ি যেন আবার আকাশে উড়ছে। উড়তে উড়তে কতো দূর চলে যাচ্ছে। হ্যান্ডেল ছেড়ে ও হঠাৎ হাততালি দিয়ে উঠ্লো। মনেই নেই যে মোটরসাইকেল চালাচ্ছে। মোটরসাইকেল ভীষণভাবে হেলে পড়লো, ব্যালান্স হারিয়ে ও আর সামলাতে পারলো না।

ও পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে চাবুকের তীব্র আওয়াজে বোঝা গেল রিং মাস্টার ভীষণ রেগে গেছে! ভোলুকে আবার মোটর সাইকেলে বসানো হল কিন্তু ও ততক্ষণে এতো ঘাবড়ে গেছে যে আর ঠিক করে মোটরসাইকেল চালাতেই পারলো না।

শো শেষ হতেই সব পশুরা নিজের নিজের খাঁচায় চলে যায়।

গোলুও ফেরে নিজের তাঁবুতে। কিছুক্ষণ বাদে ওর বাবা আসেন। বলেন, রিংমাস্টার ভোলুর ওপর খুব রেগে গেছে। আজ ভোলুর খাওয়া বন্ধ।



গোলুর খুব মন খারাপ হয়ে যায়। বলে, 'বাবা ভুল তো সকলেরই হতে পারে, আর ও বেচারা তো নেহাৎ-ই শিশু।'

গোলুর বাবা হাসে। বলে, 'ঠিক কথা, কিন্তু ও তো পশু, ওকে এভাবেই শেখাতে হয়।'

এ কথায় গোলু সন্তুষ্ট হয় না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলে, 'বাবা, ওকে কিছু খেতে দিয়ে আসি?'

'না, রিংমাস্টার যদি জেনে যায়, মালিককে বলে দেবে। তখন আমি বকুনি খাব যে আমার ছেলে পশুদের বিগড়ে দিচ্ছে। সেদিনও তুমি আর ভোলু যা-তা কান্ড করছিলে।'

'কিন্তু, বাবা, আমরা তো শুধু হাতির পিঠে চড়েছিলাম। আর তো কিছু করিনি।'

'তা মানছি, কিন্তু ভোলু তো হাতির পিঠ থেকে পড়ে যেতে পারতো। যদি পড়ে গিয়ে মরে যেত বা হাত-পা ভাঙতো তখন কী হতো? ভোলুকে খেলা শেখাতে মালিকের পয়সা লেগেছে। ও এই সার্কাসের এক শিল্পী। এইসব দেখতেই তো লোকে পয়সা খরচ করে টিকিট কাটে।'

গোলু বোঝে খেলা দেখিয়ে পয়সা রোজগারের জন্যে মানুষ পশুদের ধরে রেখেছে। এই জন্যেই মানুষ ওদের মেরে মেরে আশ্চর্য সব খেলা শেখায়। বাঘকে শেখায় আগুনের মধ্যে দিয়ে লাফাতে; হাতিকে নাচায়,কখনো বা একটা ছোট্ট টুলের ওপর দাঁড়াতে বাধ্য করে। ভালুককে দিয়ে মোটর সাইকেল চালায়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর গোলু বলে ওঠে, 'বাবা, ভোলু খুব ভালো আর বুঝদার। ও এখন খুব ছোট, আমার চেয়েও ছোট। আমি কি মোটরসাইকেল চালাতে পারি? কিন্তু ও দ্যাখো কী সুন্দর মোটরসাইকেল চালাতে পারে। আর ও এমন ভুল করবে না। আমি ওকে বুঝিয়ে বলব। আজ একটা রুটি দিয়ে আসি?'

গোলুর এই শেষ চেষ্টাতেও ওর বাবা রাজি হল না। বরং তার কড়া আদেশ, তুমি ভোলুকে কিছু দিতে যাবে না।

বড়ো নিরাশ হল গোলু। খেতে পারে না আজ ; রুটি মুখে নিলে গলায় আটকে যায়। সব রুটি পকেটে পোরে আর ভাবে কি করে ভোলুকে দিয়ে আসবে। শেষে ও মনস্থির করে ফেললো। হাত-পা ধুয়ে বিছানায় গিয়ে শুলো আর অপেক্ষা করতে লাগলো ওর বাবা কখন ঘুমিয়ে পড়বে।

সারাদিনের ক্লান্তিতে কিছু পরেই ওর বাবার নাক ডাকা শুরু হল। গোলু যখন বুঝলো ওর বাবা গভীর ঘুমে, ও আস্তে আস্তে উঠে পড়লো। রুটিভরা পকেটটা একবার হাত দিয়ে ছুঁয়ে নিয়ে পা টিপে-টিপে তাঁবুর বাইরে এলো, তারপর পশুদের আস্তানার দিকে রওনা হল।

আগেই পড়লো বাঘের খাঁচা। একটু আওয়াজেই বাঘের কান খাড়া। বড়ো বাঘ গর্জে উঠলো : 'কে?'

গোলু ভয়ে-ভয়ে বলে, 'বাঘদাদা, আমি গোলু,মাহুতের ছেলে।' এ-কথা শুনে বাঘ জানতে চায় এ-সময় ও এখানে কেন। গোলু হাতজোড় করে কাঁচুমাচু হয়ে বললো,'আরে বাবা, একটু আস্তে বলো না! আমি কিছু করতে আসিনি। ঘুম আসছে না তাই একটু ভোলুর কাছে যাচ্ছি। শুনলাম আজ ও মোটরসাইকেল থেকে পড়ে গেছে। বেশি আঘাত পেয়েছে কি না দেখি একটু। সারাদিন এত কাজ থাকে যে সময়ই পাই না।'

বাঘের আপত্তি নেই, তাই চুপ করে রইলো।

এতক্ষণে অন্য পশুদের ঘুম ভেঙে গেছে। তারা এদের কথাবার্তা শুনে নিয়েছে, তাই কেউ কিছু বললো না। সবাই বুঝলো গোলু ভোলুর কাছে যাচ্ছে।

গোলুর পায়ের আওয়াজ পেয়ে ভোলু উঠে দাঁড়িয়েছে। এমনিতেই ওর ঘুম আসছিলো না। খিদের জ্বালায় যতোটা নয় ততোটা সাজা পাওয়ার অপমানে। সাজা পেলেই ওর বাড়ির কথা মনে পড়ে। আজ ও মা-বাবা, ভাইবোন আর বন্ধুদের কথা ভাবছিলো। সেখানে ও কতো স্বাধীন ছিলো! জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো, খিদে পেলে যা-খুশি খেয়ে নিতো। ওখানে না কেউ জোর-জবরদস্তি ফুটবল খেলাতো আর না মোটরসাইকেল চালাতে হতো। ওখানে শুধু খাও-দাও আর যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াও। বাড়ির কথা ভেবে আজ ওর মন ছটফট করে, চোখে জল আসে। কিন্তু পাছে গোলু চোখের জল দেখে নেয়, ও চট করে মুছে নিলো।

গোলু ভোলুর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, 'কোথাও চোট লাগেনি তো?'

ভোলু চুপ। কী বলবে? কেমন করেই বা বলবে? গোলু চট করে পকেট থেকে রুটি বার করে ওর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললো,'নে খেয়ে নে'।

ভোলুর গলা আটকে আসে। গোলু ওর থুতনিতে হাত বুলিয়ে বলে,'ওসব কথা ভুলে যা। ওরা খুব পাজি। তবে তোরও মোটরসাইকেল সাবধানে চালানো উচিত ছিলো। যদি জোরে পড়ে যেতিস আরও লাগতো তো! তখন কী হতো?'

ভোলুর আবার বাড়ির কথা মনে পড়ে—মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, সবাইকে। সবসময় নেচে-নেচে জঙ্গলে কী আরামেই না থাকতো! ওখানে কতো স্বাধীনতা। সবাই কতো ভালোবাসতো! মা-বাবা নিজেরা না খেয়েও ওর খাওয়ার ব্যবস্থা করতো! কোনো ভুল হয়ে গেলেও কেউ ওকে মারেনি, না-খাইয়ে রাখেনি। ভোলু ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।



গোলু ওকে জড়িয়ে ধরলো। বললো,'কাঁদিস না। ভালো ছেলেরা কি কাঁদে? ছিঃ! রিংমাস্টারকে মজা বুঝিয়ে তবে আমি ছাড়বো। ও নিজেকে ভাবেটা কি? ওর সব বদমায়সি আমি বার করে দেব। আমি বাবাকে বলবো ও বিনা দোষে ভোলুকে মেরেছে। বাবা ওকে খুব মারবে। আমি যা বলি বাবা শোনে।'

কিন্তু মনে মনে গোলু ভয় পায়। ভোলু যেন জেনে না ফেলে যে ওর বাবার কোনো ক্ষমতাই নেই এ-বিষয়ে।

ও নিজের কথা একটু শুধরে নেয় : 'আচ্ছা, বাবা যদি কিছু না করতে পারে তো কী হয়েছে? ঐরাবত তো আমার বন্ধু, আমাকে নিয়ে রোজ ঘুরে বেড়ায়, ও আমার কথা ঠেলতে পারবে না। আমি বলবো, এই বদমাইশ রিংমাস্টারটার নিশ্চয়ই সাজা হওয়া উচিত। ও পশুদের বিনা কারণে উত্যক্ত করে। বেচারা পশুরা কতো ভালো, কতো সুন্দর! ওর মায়া হয় না! আর, ভুল কে না করে। তা না, সবসময় হান্টার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! যখন-তখন যাকে-তাকে ধমকাচ্ছে। হাতি ওকে একবারেই ঠান্ডা করে দেবে। যখন শুঁড়ে জড়িয়ে আকাশে ছুড়ে দেবে, তখন উনি বুঝবেন! যখন কেঁদে-কেঁদে চ্যাঁচাবে—বাঁচাও বাঁচাও — আমরা কেউ বাঁচাবো না। তুইও বাঁচাস না ভোলু। ও কাঁদুক,তবে ও শুধরোবে।'

গোলুর কথা শুনে ভোলু হাসতে লাগলো।

গোলু ব্যাপারটা বুঝলো। কিন্তু ও হার মানার পাত্র নয়। বললো,'ঠিক আছে, ঠিক আছে। হাতি ওকে ভয় পায় তো কি হয়েছে? বাঘও তো আমার বন্ধু। ও রোজ আমার

সঙ্গে হাত মিলোয় আমাকে খুব ভালোবাসে। জানিস, ও কি সাংঘাতিক! সবাই ওকে ভয় পায়। আমি ওকে বলবো। ও এমন ধমক দেবে যে রিংমাস্টারের সব রাগ চুপসে যাবে। ও নিজেকে ভাবেটা কি? ওর হান্টার-ফান্টার সব কেড়ে নেওয়া হবে।'

এবার ভোলু জোরে হেসে উঠলো। গোলু ঘাবড়ে গিয়ে বললো,'আরে, আস্তে হাস। বাবার ঘুম ভেঙে যাবে। নে নে, ভালো ছেলেদের মতো খাবার খেয়ে নে।'

গোলু এক গ্রাস নিয়ে ভোলুর মুখে দিয়ে দিল, আর ভোলু খেতে লাগলো। গোলু ব'লে উঠলো, সাবাস! ভোলুও এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে গোলুর মুখে দিতে চাইল।

গোলু বলে, 'আরে, তুই আমাকে খাওয়াচ্ছিস! আমি তো অনেক খেয়েছি। তুই খা। কটাইবা রুটি আছে! দুটো রুটিতে তোরই বা কি হবে, বল্ !

কিন্তু গোলু ওর সঙ্গে না খেলে ভোলু আর খাবেই না। রুটি না হয় দুটোই হল, কিন্তু রুটির এত স্বাদ ও জীবনে কখনো পায়নি। রুটি কম, তরকারিও বেশি নেই, এমন ও গ্রাহ্যই করছে না। খেতে যে এত ভালো লাগে ও যেন প্রথম জানলো।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে গোলু বললো,'দ্যাখ ভোলু, আমি জানি যে রিংমাস্টারের হাতে যতক্ষণ হান্টার আছে ওর সঙ্গে পারা যাবে না। আমি এ-কথা অনেকবার ভেবে দেখেছি, কিন্তু হান্টারের চেয়েও বড়ো কথা হল পশুদের মধ্যে সাহস নেই। তুই যখন সার্কাসে খেলা দেখাস তোর কি হাত বাঁধা থাকে? হাতিও কি বাঁধা থাকে তখন? বাঘও কি খাঁচার বাইরে আসে না সে-সময়? তোর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। তুই-ই বল্, রিংমাস্টারের গায়ে কি হাতির চেয়ে বেশি জোর? বাঘ কি রিংমাস্টারের চেয়ে দুর্বল? তবে এরা ওর হান্টার ছিনিয়ে নেয় না কেন?

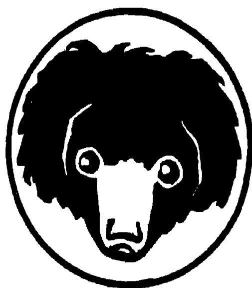
কথাটা ঠিক। বাঘ, হাতি এবং অন্য অনেক জন্তু রিংমাস্টারের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। বিপজ্জনকও।

'দ্যাখ, এখন সব কথা বলা সম্ভব নয়। তবে একটা কথা তোকে বলে রাখছি। ধর, বাঘ রিংমাস্টারের কথা শুনলো না, তাতে ও বাঘের কী এমন ক্ষতি করতে পারবে? হান্টার চালাবে, এ-ই না? হান্টারে কী এমন হবে? লাগুক এক-আধ হান্টার। বাঘ এক ঝাপট মেরে ওর হান্টার যদি কেড়ে নেয়, ও কিছু করতে পারবে? বাবুসাহেব তখন পালাতে পথ পাবেন না।'

ভোলুর মনে হল কথাটা তো ঠিক, কিন্তু যতো সোজা মনে হচ্ছে ততো সোজা নয়। বাঘ যে হান্টারকে ভয় পায় তার পেছনে কোনো কারণ তো নিশ্চয়ই আছে। যদি হান্টার ছিনিয়ে নিলে কাজ হয় তাহলে পশুরা এতো গোলামি এতদিন কেন সয়েছে? পশুরা এত ভীতু তো নয় যে একটা হান্টারও ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

ভয়টা শুধু হান্টারের নয়, আরো কিছু ব্যাপার আছে। সেটা যে কী, তা ওর মগজে ঢোকে না;তাই ও চুপ করে থাকে।

গোলুরও মনে হ্ল ও যা বললো তাতে যেন কোথায় একটা গরমিল থেকে গেছে। কিন্তু কী সেটা? তবে চিন্তা করার সময় নেই এখন। বললো,'এখন যাই তবে। বাবা যদি উঠে পড়ে থাকেন তাহ্লেই মুশকিল। কাল আবার দেখা হ্বে।'



গোলুর স্বপ্ন

অনেক রাত পর্যন্ত গোলুর ঘুম এলো না। ওর মাথায় খালি চিন্তা ভোলুকে এই বন্ধন থেকে কী করে মুক্ত করা যায়। ভাবতে-ভাবতে কে জানে কখন ঘুম এসে গেছে।

ও স্বপ্ন দেখছে মোটরসাইকেলের পেছনে বসে চলেছে। কী সুন্দর লাল রঙের মোটরসাইকেল। হঠাৎ মনে পড়লো, আরে, এটা তো রিংমাস্টারের মোটর সাইকেল। কিন্তু চালাচ্ছে তো ভোলু। কী মজা, কী জোর চলেছে মোটর সাইকেল। শাঁ-শাঁ হাওয়ায় ওর চুল উড়ছে। ভোলুর লোমে যেন ঢেউ। ও ভোলুকে কষে ধরে আছে আর ভোলু মনের আনন্দে গান গাইছে :

রঙচঙে রূপসী
গাড়ি দু-চাকার
এতো ভালো এ-বাইক
নয় তবে আমার।
তবু কিন্তু সাথে থাকে
একটু-আধটু জ্বালায়
কিক মারলে চালু হয়ে
ওড়ে যেন হাওয়ায়।
তফাৎ যাও, তফাৎ যাও
হর্ণ যখন বাজে—
যেখানে তুমি যাবে
সুদূর কোনো ঘরে
তোমায় ঠিক পৌঁছে দেবে।



আমি চলি আমার বাড়ি
সুখের দিন এলো বলে
সবাইকে তাই আজ বলি
রিংমাস্টারের ব্যাপারটি :

আমাকে দেখান ভয়
বেঁধে রাখেন দড়িতে
হান্টার দিয়ে পিটিয়ে
ধমক দেন চুটিয়ে।

এবার করো হায়-হায়
হাত জুড়ে দাঁড়িয়ে
আমি দেব তাড়িয়ে
খানিক রাগ দেখিয়ে।

হান্টার তোমার থাকবে পড়ে
পিস্তল কাজ দেবে না
খাঁচা পুড়ে শেষ হবে
তোমায় শেষে ভাগতে হবে।

তারপর গোলু গাইবে গান
ভোলু তার নাচ দেখাবে
মোদের যখন দিন আসবে
এরা সব ঘাবড়ে যাবে।

আসবে গো আসবে
সুযোগ মোদের আসবে।

গোলু ভোলুর গলায় গলা মিলিয়েছে। যেন হাওয়ার সঙ্গে কথা কইতে-কইতে মোটরসাইকেল ছুটেছে। জঙ্গলের মাঝ বরাবর পাহাড়ি রাস্তা চলেছে ভোলুর বাড়ির দিকে। ভোলুর বাড়ি প্রায় এলো বলে। ওরা যখন প্রায় পৌঁছে গেছে কে যেন গোলুকে ডাকলো। সেই ডাকে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ওর বাবা ওকে ডাকছে, 'ওরে গোলু, আর কতো ঘুমোবি? দ্যাখ্ সকাল হয়ে গেছে।'

ওকে চা-জলখাবার খাইয়ে ওর বাবা যখন বেরুচ্ছে, গোলু বলে, 'একটা কথা বলবো বাবা?'

আদর করে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ওর বাবা বলে, 'কী ব্যাপার? বল্।'

'বাবা একটা কথা আমার মাথায় ঢোকে না জন্তুরা রিংমাস্টারকে এতো ভয় পায় কেন?'

বাবা হেসে বলে, 'হান্টার রে, হান্টার।'

'কিন্তু, বাবা, পশুর গায়ে তো মানুষের চেয়ে বেশি জোর। ওরা যদি রিংমাস্টারের হান্টার কেড়ে নেয়?'

'খোকা, মানুষের জোর তো শুধু তার শরীরে নয়, বুদ্ধিও তো আছে। তুই কখনো ভেবে দেখেছিস যে মানুষ কী করে হান্টার বা অঙ্কুশ ব্যবহার করতে পারে? হাতি কেন পারে না? বাঘ কেন পারে না? বা তোর ঐ বন্ধু ভোলু কেন পারে না?'

'কেন না পশুরা ভালো। ওরা কাউকে মারধোর করে নাচায় না। কারো পিঠে চড়ে না, নিজের পায়ে হাঁটে।'

বাবা হেসে বলে, 'ঠিক আছে, তোর কথা আমি মানছি, কিন্তু আসল ব্যাপার কি জানিস? পশুদের অতো বুদ্ধি নেই। ধর্, কেউ হান্টার ছিনিয়েই নিল, কিন্তু তারপর সে যাবে কোথায়? আমরা ওদের ধরার অনেক কায়দা জানি।'

'কি রকম?'

'যেমন ধর্, জাল আর খাঁচা। যদি কেউ বেশি গোলমাল করে, হাতের বাইরে চলে যায়, তার জন্যে বন্দুক আছে। তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। তুই তো দেখেছিস সার্কাসের দল যখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে থাকে, একজন বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। সে তো শুধু দেখাবার জন্যে নয়, না? যাক, এবার আমি যাই গোলু ; দেরি হয়ে যাচ্ছে। হাতিদের খাওয়া হয়নি এখনো। কষ্ট পাচ্ছে। ওদের ঘাসপাতা দিতে হবে।'

'আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

'তোর তো বাপু কথার শেষ নেই। কতো কাজ পড়ে রয়েছে এদিকে!'

'শুধু একটা কথা, মানুষ আসলে পশুদের ধরে কেন?'

'তুই আবার জঙ্গলের রাজা কবে হলি রে?'

'বলো না বাবা।'

'নিজের কাজ বাগাতে, মজা লুটতে; আর কিসের জন্য?' এই বলে ওর বাবা কাজে চলে গেল। গোলু আর কিছু বললো না, শুধু ভেবে চললো। নিজের স্বার্থের জন্যে অপরকে বন্দী করা ঠিক নয়।

গোলু সোজা ভোলুর কাছে গিয়ে ওকে অনেকক্ষণ বোঝালো। বললো,'দ্যাখ ভোলু, পশু যে মানুষকে ভয় পায় তার কারণ আছে। মানুষ বড় বিপজ্জনক। তার

কাছে বন্দুক আছে। জানোয়ার মারতে তার হাত কাঁপে না। তুই হান্টার কাড়িস না। সাংঘাতিক হতে পারে। আমি অন্য কোনো উপায় ভাববো।

ওরা কিছুক্ষণ ফুটবল খেললো। গোলুর মনে পড়ে গেল কাল রাতের স্বপ্নটা। ভোলুকে শোনালো। শুনে ভোলু খুব খুশি।

গোলু মনে করতে চেষ্টা করায় গানের দুটো লাইন আবার মনে পড়লো। গাইলো ঃ

র ঙচঙে রূপসী
গাড়ি দু-চাকার
এতো ভালো এ-বাইক
নয় তবে আমার।

গান শুনে ভোলুর খুশি আর ধরে না। ও তালে-তালে অনেকক্ষণ নাচলো। গোলু খুব হাসে আর বারবার ঐ গান গায়। হঠাৎ গোলুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেললো। ও চিৎকার করে উঠলো,'শোন, শোন।'

ভোলু ঘাবড়ে গিয়ে নাচ ছেড়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'তুই তো মোটরসাইকেল চালাতে পারিস; তাই না?'

ভোলু ঘাড় নেড়ে জানালো যে পারে।

'তবে তুই পালা না।'

ভোলুর মাথায় ঢোকে না কিছুই।

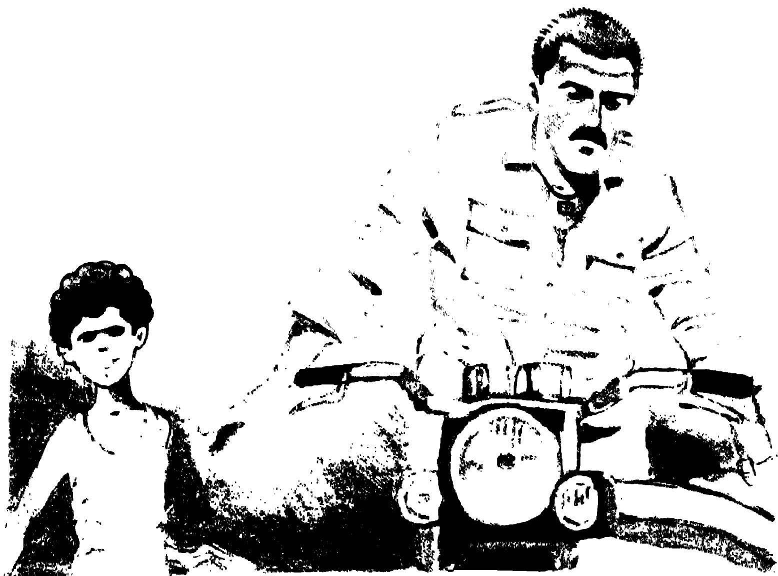
'তুই পালা, যেমন স্বপ্নে পালিয়েছিলি।'

কথাটা বেশ লাগলো ভোলুর। ও ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগলো।

'কিন্তু ঐ মোটরসাইকেল যা তুই সার্কাসে চালাস ওটা তো বেকার। তোর চাই নতুন মোটরসাইকেল। তাই না? ঠিক যেমন রিংমাস্টারের আছে।'

রিংমাস্টারের নাম শুনেই ভোলুর আত্মারাম খাঁচাছাড়া। ও মাথা নেড়ে 'না-না' করতে লাগলো। ভোলুর সম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে গোলু ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললো, 'আরে তুই ঘাবড়াস না। একটু ভেবে দ্যাখ্, এটা কোনো চুরি না। অনেক দূর চলে গিয়ে মোটরসাইকেল ছেড়ে দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যাস; বুঝলি?'

ভোলুর কিন্তু ভয় কমে না। ও 'না-না' করে মাথা নেড়েই চলেছে। গোলু বুঝতে পারছে ভোলুর কিসের ভয়। পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে রিংমাস্টার যে ওর কী করবে তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। গুলিও চালাতে পারে। গোলু বুঝলো এ প্ল্যান বিপজ্জনক হতে পারে।



ও ভেবে চলেছে ভোলু কিভাবে পালাবে অথচ ধরাও পড়বে না। সারা রাত এক চিন্তা। সমস্যাও তো অনেক। দরজায় চৌকিদার বসে থাকে। তাকে কাটিয়ে বেরোনো সোজা নয়। তার কাছে বন্দুকও থাকে। তাছাড়া নতুন মোটরসাইকেলে চাই, আর তা শুধু রিংমাস্টারের কাছে থাকে। তা পাওয়া সহজ নাকি? আর গোলু তো জানেও না ভোলুর বাড়ি কোথায়, কতোদূর। তবে একটা কথা গোলু বুঝতে পেরেছে যে বিপদের বোঝা কিছুটা ঘাড়ে না নিলে ভোলু স্বাধীন হতে পারবে না।

পরের দিন গোলু সার্কাসের চারিদিক খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখলো। কাঠের খাম্বা পুঁতে-পুঁতে তাদের টিনের বড়ো-বড়ো চাদর ঠুকে দেয়াল তৈরি হয়েছে। এক জায়গায় টিনের চাদর নড়বড়ে মনে হল। ও একটু চাপ দিতেই স্ক্রু বেরিয়ে আসতে লাগলো। স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে একটা পুরো চাদর খুলে ফেলা যায়। তাতে এত বড় ফাঁক হবে যে শুধু ভোলু কেন, মোটর সাইকেলও বেরিয়ে যাবে।

পরে ওর মনে পড়লো ভোলু তো মোটর সাইকেল স্টার্ট করতে জানে না। সার্কাসে মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিয়ে তারপর ওকে বসিয়ে দেওয়া হয়, তবে ও চালায়। আর গোলু তো চালাতে জানেই না। ও তো শুধু স্বপ্নে মোটর সাইকেলে বসেছিলো, আর তাও ভোলুর সঙ্গে। এবার কী হবে?

ভাবলো, আমাকে তো কেউ মোটরসাইকেল চালাতে দেবে না। আমি শুধু ভালো করে দেখি রিংমাস্টার কী করে চালায়।

বেড়াতে বেড়াতে ও রিংমাস্টারের মোটরসাইকেলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। চৌকিদার ওটার ঝাড়পোঁছ করছিলো।

কী করছো, চৌকিদার কাকা?'

'সাহেব কোথাও বাইরে যাচ্ছেন, তাই মোটরসাইকেল ঝেড়ে মুছে রাখছি।'

'কবে?'

'মনে হয় এবারই যাবেন।'

'আচ্ছা কাকা, তুমি কি মোটর সাইকেল চালাতে জানো?'

'আমি তো কখনো চালাইনি খোকন। হ্যাঁ, চালাতে দেখেছি বটে। এতে একটা চাবি লাগে। তারপর এইভাবে কিক্ মারতে হয়।'

চৌকিদার কিক্ মেরে দেখালো।

'কই চলছে?'

'বললাম না, একটা চাবি লাগে? তবে তো চলবে।'

'চাবি কোথায় দিতে হয়?' চৌকিদার চাবির জায়গাটা দেখিয়ে দিলো।

'চাবি কই?'

'চাবি তো সাহেবের কাছে। তুই কখনো গেছিস ওঁর তাঁবুতে? মাঝখানের খাম্বাটায় একটা পেরেকে ওটা ঝোলে।'

'কাকা, একবার চেষ্টা করি?'

'আরে বাবা, সাহেব এসে পড়বেন। রেগে যাবেন। তা ছাড়া তুই এখন ছোট, তাই না? বড়ো হয়ে নিজের একটা মোটর সাইকেল কিনে নিস আর চালাস। এটা কতো বড়ো মোটর সাইকেল! তোর ওপর পড়ে গেলেই তো হয়েছে।'

'কাকা, একবার কিক মেরে দেখি? শুধু একবার।'

'না, সাহেব এসে পড়লেই দুজনকেই বকুনি খেতে হবে।'

'শুধু একবার': গোলুর মিনতি।

'দ্যাখ্, জেদ ভালো জিনিস না': চৌকিদার বোঝাবার চেষ্টা করে। গোলু উদাস চোখে মোটর সাইকেলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

চৌকিদারের মায়া হয়: 'আচ্ছা নে, তাড়াতাড়ি একটা কিক দিয়ে নে।' চৌকিদার কিকের রডটাকে সোজা করে দিলো। প্রথমবারের চেষ্টায় গোলু তো কিছুই করতে পারলো না, কিন্তু দু-এক বার চেষ্টা করতে করতে ও কিক মারতে পারলো।

চৌকদার ঠায় রিংমাস্টারের তাঁবুর দিকে তাকিয়ে ছিলো। রিংমাস্টারকে আসতে দেখে আচমকা ধাক্কায় গোলুকে মোটরাসাইকেলের কাছ থেকে সরিয়ে দিলো। রিংমাস্টারের হাতে ছিলো লাল হেলমেট। হেলমেট পরে, চাবি ঘুরিয়ে, কিক মেরে মোটরসাইকেল চালিয়ে নিমেষের মধ্যে ও সার্কাসের হাতার বাইরে বেরিয়ে রাস্তার ভিড়ে মিশে গেল।

গোলু খানিকটা এদিক-ওদিক করে রিংমাস্টারের তাঁবুর কাছে গিয়েই বসলো। রিংমাস্টার তাড়াতাড়িই ফিরলো। মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে, হেলমেট খুলে, চেনে-বাঁধা চাবি আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে ও নিজের তাঁবুতে চলে গেল। গোলু তাঁবুর পিছনে গিয়ে একটা ফুটোর মধ্য দিয়ে সব দেখতে লাগলো। রিংমাস্টার টেবিলে হেলমেট রেখে সামনের খাম্বায় চাবি ঝুলিয়ে রাখলো।

গোলু এবার দৌড়ে ভোলুর কাছে এসে ওকে নিজের পুরো প্ল্যান বোঝালো।

প্ল্যান শুনে ভোলু তো থ। কিন্তু গোলু ওকে বোঝায়: 'দ্যাখ, ভয় পেলে কাজ চলবে না। যা বলছি করে যা; একদম ভাবিস না।' যেতে যেতে আবার ফিরে এলো গোলু: 'ভোলু, শোন, আর কোনো ভুল করিস না। খুব সাবধান হয়ে মন দিয়ে কাজ কর। বুঝলি তো?'

চিন্তায় চিন্তায় গোলুর সারাদিন কেটে গেল। রাতে বিছানায় শুয়ে ও নিজের বাবাকে জিজ্ঞেস করলো,'বাবা, ভোলু এসেছে কোথা থেকে? ওর মা-বাবা কোথায়?'

'সে অনেক ব্যাপার। একবার কাশীপুরে আমাদের সার্কাস চলছিলো। কাশীপুর শহরটা হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে। কাছেই পাহাড়, যে-পাহাড়ে গভীর জঙ্গল।'

'আর সে জঙ্গলে অনেক জন্তু জানোয়ার?'

'হ্যাঁ, সবরকম জন্তু আছে সেখানে—বাঘ, হাতি, ভালুক, হরিণ, আরো অনেকরকম। একদিন আমাদের রিংমাস্টার জিপ নিয়ে জঙ্গলের দিকে গিয়েছিলো। ফেরার সময় এই ভালুকের বাচ্চাটাকে জঙ্গলের মধ্যে থেকে টুক করে তুলে নিয়ে এসেছে। তখন বাচ্চাটা খুব ছোট।

'কতোদিন আগেকার কথা?'

'এই এক-দেড় বছর হবে'

গোলু কিছুক্ষণ চিন্তা করলো,তারপর বললো,'বাবা, কাশীপুর থেকে জঙ্গল কতো দূর?'

'হবে পনের-কুড়ি কিলোমিটার।'

'আর এখান থেকে কাশীপুর?'

'বেশি দূর নয়। এই, পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটারের মতো।'

'কোন দিকে?'

'কোন দিকে?'—মাহুতের ঘুম আসছে এবার —'তোর কী দরকার রে? ওখানে যাবি নাকি?' গোলুর প্রশ্নের জ্বালায় মাহুত হাঁপিয়ে ওঠে।

'বলো না বাবা! এমনি জিজ্ঞেস করছি।'

মাহুত একটু চিন্তা করে বললো,'এমনি তো উত্তর দিকে, কিন্তু দিক নিয়ে কী হবে? এই সামনের রাস্তাটা সোজা কাশীপুর যায়। এটা ধরে আরও এগিয়ে গেলে পাহাড়।'

গোলুর খুশি আর ধরে না। ও ঠিক করলো, কাল রাতে ভোলুকে মুক্ত করে দেবে। সব ঠিকমতো চললে পরের দিন ভোলু নিজের মা-বাবার কাছে পৌঁছে যাবে। এ কথা ভাবতেই পরম তৃপ্তিতে ওর মন ভরে গেল।

সেদিন ওর চোখে নামলো গভীর ঘুম। পরদিন সকাল থেকেই আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে। রোজকার মতো সারাদিন কাটে ব্যস্ততায়। এরই মধ্যে যতোবার পেরেছে গোলু মোটর সাইকেলটাকে খুঁটিয়ে দেখেছে। সার্কাসের বড়ো গেটের সামনে এক চা-ওয়ালা দোকান পেতেছে। গোলু একবার ওর কাছেও ঘুরে এলো। চা-ওয়ালা বললো, এ-রাস্তা সোজা কাশীপুর যায়।

'আরো এগিয়ে গেলে এ-রাস্তা জঙ্গল পর্যন্ত যায়, তাই না?'

'আমি তো কখনও যাইনি তবে শুনেছি পাহাড় বেশি দূরে নয়। সেখানে জঙ্গল খুব ঘন।'

সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে, ও ভোলুর কাছে গেল। পুরো প্ল্যান ওকে বারবার বোঝালো। তবে ওর মনে হল, ভোলু বড়ই ঘাবড়ে আছে। ওর এই ঘাবড়ানো দেখে গোলু শেষ পর্যন্ত রেগেই গেল।

ওকে ধমক দিয়ে বললো,'সাহস চাই। বাপ-মায়ের কাছে যাবি কি যাবি না? ভয় পেতে থাকলে নাকে দড়ি চিরকাল বাঁধাই থাকবে আর রোজ সন্ধ্যে হলেই হান্টারের ইশারায় নাচবি। এই খুঁটিতে বাঁধা থেকে সারাজীবন কাটিয়ে দিবি; বুঝলি?'

ধমকে কিছুটা ফল হল। ভোলু নিজেকে একটু সামলালো।

'এখন শুয়ে পড়, সারারাত ঘুমোতে পারবি না। যতটা পারিস এখনই আরাম করে নে।' এই বলে গোলুও নিজের তাঁবুর দিকে এগোল।

সেদিন রাতে

সার্কাসের শেষ শো চলছে। গোলু কিছুক্ষণ প্যান্ডেলের ভেতরে বসলো। যখন দেখলো সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তখন ও চুপিচুপি কেটে পড়লো। কার আর তখন ওর দিকে তাকাবার ফুরসৎ?

ও সোজা চলে গেল রিংমাস্টারের তাঁবুর দিকে। চারিদিক নিস্তব্ধ। চৌকিদারের পুরো লক্ষ্য তখন দর্শকের দিকে। তাঁবুর পর্দা সরিয়ে গোলু সোজা ভেতরে চলে গেল। ভেতরে আলো নেই তবে বাইরের বালব্ থেকে এতটা আলো আসছে যাতে ও সহজেই খাম্বায় ঝোলানো মোটরসাইকেলের চাবি দেখতে পেল। টেবিলের ওপর হেলমেটটাও রয়েছে। ও দুটো জিনিস নিয়েই বেরিয়ে এলো। চাবি মোটরসাইকেলে লাগিয়ে দিলো আর হেলমেটটা সামনেই মাটিতে রেখে দিলো।

ওখান থেকে গোলু গেল টিনের ঘেরার কাছে। ঢিলে প্যাঁচের টিনের চাদরটা যেখানে, সে-জায়গাটা চিনে নিতে তার দেরি হয়নি। স্ক্রু-ড্রাইভার খুঁজে পায়নি বলে একটা ছোট ছুরি এনেছে সঙ্গে। সেই ছুরি দিয়ে স্ক্রু গুলোকে এতটা আলগা করে আনলো যে এবার অনায়াসে হাত দিয়ে খুলে ফেলা যায়।

সার্কাসের খেলা শেষ হতেই যে-যার নিজের তাঁবুতে চলে গেল। খাওয়া-দাওয়া সারলো। সবাই দিনভর খেটেখুটে ক্লান্ত। একে-একে সব আলো নিভে গেল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম নামলো সকলের চোখে। যখন গোলু বুঝে গেল কেউ আর জেগে নেই, ও হামাগুড়ি দিয়ে ভোলুর কাছে এলো। ভোলু তো ওর অপেক্ষায় ছিলোই। গোলু এসে ওর বাঁধন খুলে দিলো। যেই-না ভোলু ওর পা উঠিয়েছে, ঘুঙুর বেজে উঠ্লো। গোলু তখন ওর পা থেকে তাড়াতাড়ি ওটা খুলে নিল।

এখন আর সেই সকালের হালকা মেঘ নয়, ঘন কালো মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। অন্ধকার হয়েছে গভীর। খুব কাছের জিনিসও দেখা যায় না। গোলু সামনে

সামনে চলেছে, ভোলু তার পেছনে। তবু গোলু মাঝেমাঝেই হোঁচট খাচ্ছে। শেষপর্যন্ত ভোলু ওর হাত ধরলো। তাঁবুর অন্ধকারে গা-ঢাকা দিতে দিতে দুজনে টিনের ঘেরার সেই জায়গায় এলো যেখানে সার্কাসের খেলা চলাকালীন গোলু স্ক্রু ঢিলে করে দিয়ে গিয়েছিলো। এখন সেই ঢিলে স্ক্রু অনায়াসে বার করে ফেলে দিলো। তারপর একটুও আওয়াজ না করে টিনের একটা চাদর সরিয়ে একপাশে রেখে দিল। তারপর আরও একটা চাদর সন্তর্পণে সরাতেই সামনে রাস্তা দেখা গেল। গোলু বাইরে বেরিয়ে চারিদিকে তাকায়, কেউ দেখছে না তো!

চারিদিকে নির্জন। খানিক দূরে রাস্তার লাইটপোস্টে বালব্ জ্বলছে। কিন্তু সার্কাসের আশপাশটা মোটামুটি অন্ধকার। ওরা তো এই চায়। এখন শুধু মোটরসাইকেলটা আনলেই হয়।

গোলু হ্যান্ডেল ধরে ঠেললো কিন্তু মোটরসাইকেল স্ট্যান্ড থেকে নামাতে পারলো না। আরো জোর দিল, এবার মোটরসাইকেলটা একটু নড়লো বটে কিন্তু এবারও স্ট্যান্ড থেকে নামলো না। ভোলু কি আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে? যেই গোলু হ্যান্ডেল ঠেলেছে, ভোলু পেছন থেকে যতোটা পারে জোর দিয়ে ধাক্কা দিল। এবার খুব জোরে নড়ে উঠে খট্ করে আওয়াজ করে মোটরসাইকেল স্ট্যান্ড থেকে নেমে এলো। মোটরসাইকেলটা হঠাৎ স্ট্যান্ড থেকে নামায় গোলু ঠিক সামলাতে পারলো না, আর ওটা হেলে পড়তে লাগলো। গোলু ওর তলায় চেপে যায় আর কি! এই দেখে ভোলু তক্ষুণি নিজের পুরো শক্তি দিয়ে মোটর সাইকেলটা নিজের দিকে টেনে ওটাকে পড়তে দিল না। এইসব টানাটানিতে এত আওয়াজ যে দুজনেই বেশ ভয় পেল। কিছুক্ষণ যেন ওদের নিঃশ্বাসই পড়ে না। কেউ শুনে নেয়নি তো? কিন্তু ভাগ্য ভালো সবাই এত ক্লান্ত ছিলো যে কেউ কিছু বুঝতেই পারেনি।

তবে এটা ঠিক যে চৌকিদারের একটু সন্দেহ হয়েছিলো। ও ছিলো গেটে বসে। চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সন্দেহ করার মতো অবশ্য কিছু টের পেলো না। ভাবলো, স্বপ্নে কিছু দেখেছে হয়তো। আর জানোয়ারগুলো তো কম বদমায়েস নয়; খুটখাট করতেই থাকে। ঠান্ডা পড়ছে, তাই ও কম্বল বেশ করে জড়িয়ে নিয়ে ঝিমোতে লাগলো।

এবার ভোলু মোটরসাইকেল ধরলো। ঠিকমতো সামলাতে পারে না। দুজনে মিলে কোনরকমে ঠেলা শুরু করলো। ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল ততোদূর যেখানে, গোলু বুঝলো, মোটর সাইকেল 'স্টার্ট' হলেও কেউ শুনতে পাবে না। এবার এত দূর এসে গোলু কিক্ মারতে লাগলো। কিক মারতে মারতে হাঁফিয়ে উঠলো। কিন্তু মোটর সাইকেল স্টার্টই নেয় না। হঠাৎ ভোলুর মনে পড়লো রিংমাস্টার প্রায়ই মোটরসাইকেল চালাবার আগে নিচের কি-একটা ঘুরিয়ে দেয়। খুঁজে দেখলো সত্যি

বাঁ দিকে ট্যাঙ্কের নীচে একটা 'নব্' রয়েছে। ভোলু ওটা ঘুরিয়ে দিল। পেট্রোলের রাস্তা খুলে গেল আর এবার গোলু কিক মারতেই ঘর-ঘর আওয়াজ করে মোটরসাইকেল স্টার্ট নিয়ে নিলো।

গোলু ওর বাবার একটা জামা সঙ্গে এনেছিলো, ওটা ভোলুকে পরিয়ে দিলো। হেলমেট খুঁজলো কিন্তু হেলমেট ফেলে এসেছে। কি যে করে এবার! হেলমেট তো চাই নইলে লোকে ভোলুকে দূর থেকে চিনে ফেলবে, আর তখন ঝামেলা হবে। ও মোটরসাইকেল বন্ধ করতে চাইলো কিন্তু পারলো না। শেষকালে ভোলুকে মোটরসাইকেল ধরতে দিয়ে 'এখুনি আসছি' বলে ও সার্কাসের তাঁবুর দিকে দৌড়ে গেল।

ভোলুর মনের অবস্থা তখন এমন যে ও চায় গোলু ওকে একটুও ছেড়ে নাযায়। কিন্তু গোলু তো ততোক্ষণে সার্কাসের হাতায় ঢুকে পড়েছে। একে ঘাবড়ানি , তার ওপর ঠান্ডা, বোলুর তো হাত-পা কাঁপতে লাগলো। ভগবানের নাম জপতে জপতে ও গোলুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

গোলু তাড়াতাড়ি ফিরলো। ফিরে দ্যাখে এক কান্ড! ভোলু ধরে রাখতে পারেনি. মোটরসাইকেল গেছে পড়ে, আর ভোলু ওটা সোজা করে দাঁড় করাবার জন্যে চেষ্ট করে চলেছে।

গোলু হেলমেট একধারে রেখে ভোলুকে সাহায্য করতে নেমে পড়লো । অবশেষ মোটর সাইকেলটাকে দাঁড় করানো গেল। ওর স্টার্ট তো বন্ধ হয়নি, ঘর-ঘর করেই চলেছে, গোলু নিশ্চিন্ত হল। ভোলুকে বললো,'ঘাবড়াস না। তুই তো মোটরসাইকেল চালাতে জানিস। এ কি করছিস? ঠিক করে জোরে চেপে ধর।

ভোলু মোটরসাইকেলটা ধরুক ; চট করে হেলমেটটা ওকে পরাতে হবে। কিন্তু ভোলুর তো এখনো নাকে দড়ি, মুখের ওপর চামড়ার পটি। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ছুরি বার করে গোলু ওগুলো কেটে দিলো। এই প্রথম ভোলুর মনে হল ও স্বাধীন হতে চলেছে।

হেলমেট পরায় ভোলুকে এবার মনে হচ্ছে একটা মানুষ। একটু অসুবিধে হচ্ছিল অবশ্য, কিন্তু গোলু বোঝালো, 'এতে তোকে কেউ সহজে চিনতে পারবে না। সবাই ভাববে একটা লোক যাচ্ছে। তাছাড়া তুই যদি কোথাও পড়ে যাস তোর চোট লাগবে না। হেলমেট পরা ভালো।' ভোলু কেবল মাথা নাড়ে।

শেষপর্যন্ত গোলু কোনোরকমে ভোলুকে মোটর সাইকেলে বসালো। প্রথমে ওকে জড়িয়ে ধরলো, তারপর ওর পিঠ চাপড়ে বললো, 'তোর মা-বাবাকে আমার প্রণাম জানাস।'



গোলু আরো অনেক কিছু বলতে চায় কিন্তু আবেগে ওর গলা ধরে যায়। তাছাড়া ওর মনের ভাব ও ভোলুকে জানতে দিতে চায় না। কোনোরকমে চোখের জল আটকে রাখে।

'চালা শীগ্‌গির! আর সময় নেই!'

ভোলু ক্লাচ চেপে ধরলো, গিয়র এক নম্বরে আনলো, আর তারপর আস্তে আস্তে ক্লাচ ছাড়তেই মোটরসাইকেল এগোলো। গোলু পাশে পাশে দৌড়তে দৌড়তে আর একবার পিঠ চাপড়ে বললো, 'নিজের ওপর লক্ষ্য রাখিস। তাড়াতাড়ি চালাবি আর কোথাও দাঁড়াবি না। এ-রাস্তা পাহাড় পর্যন্ত সোজা যায়। আবার দেখা হবে।

গোলু থেমে গেল। অন্ধকারেও বুঝতে পারলো ভোলু ঘাড় নেড়েছে। গোলু দেখতে লাগলো ও চলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর মোটর সাইকেল ওকে নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গোলুর মনে আজ খুশিও, দুঃখও। ওর বন্ধু চলে গেছে। হয়তো আর কখনো দেখা হবে না। কান্না পায় ওর। কিছুক্ষণ ফোঁপায় তারপর চোখ মুছে ফিরে আসে।

এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে। আকাশে মেঘ ডাকে। বিদ্যুৎ চমকায়। জোর বৃষ্টি হবে। গোলু মনে মনে প্রার্থনা করে: 'ভগবান, ভোলু বাড়ি পৌছনোর আগে বৃষ্টি যেন না নামে।'

সারাদিনের ক্লান্তিতে আর জাগতে পারে না, ঘুমে ঢলে পড়ে। জানতেও পারে না বৃষ্টির টুপটাপ কখন বদলে গেছে প্রবল বর্ষণে।



এক যে ছিলো পাখি

ভোলু চলছে তো চলেছেই। কে জানে কতো দূর। কে বা জানে ঘন অন্ধকার কে বা জানে বৃষ্টি। কে বা জানে এ-পথ কোন দিকে যায়। এখনো মনের মধ্যে গেঁথে আছে রিংমাস্টারের আতঙ্ক। মোটরসাইকেল চালাতে চালাতে কোমর টনটন করে, আঙুল ব্যথা করে, তবুও চলেছে তো চলেছেই। অবশেষে মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনটাই বন্ধ হয়ে গেল। কোনো রকমে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে ভোলু কিক মারবার চেষ্টা করতে লাগলো। প্রথমে তো কিক্ই লাগে না, পরে কিক লাগলেও গাড়ি স্টার্ট নেয় না।

হাল ছেড়ে দিয়ে ও ওখানেই মোটরসাইকেল ফেলে দিলো। বর্ষা প্রায় থেমে এসেছে, চলছে টিপটিপ বৃষ্টি। ও এক গাছের নীচে বসলো। হতাশা, ক্লান্তি আর ভয়ে কান্না এসে যায়। নিজেকেই দোষ দেয়। এ কোন্ দুর্বুদ্ধি হল যে ওখান থেকে পালালো! এখন যায় কোথায়? মা-বাবার নাম, বাড়ির ঠিকানা, কিছুই মনে নেই। তাদের চেহারাও মনে নেই। ও অবশ্য জানে সার্কাসে যদি ফিরে যায় রিংমাস্টার ছেড়ে কথা কইবে না। মারতে মারতে পিঠের ছাল তুলে দেবে। একথা ভেবেই ও ভয়ে হিম হয়ে যায়। আর কোনো জায়গা তো চেনেই না, তাই অন্য কোথাও যাবার তো প্রশ্নই নেই।

এখন কাছে গোলু থাকলে এতো ঝামেলা হতো না। ভোলু নিজে তো কারো সঙ্গে কথাই বলতে পারে না। মানুষের মতো কথা বলতে শেখেনি। কাকে জিজ্ঞেস করবে যে কোন রাস্তায় যাবে? আর না জিজ্ঞেস করে যাবেই বা কী করে? গোলুর কথা খুব মনে পড়ছে এখন। সকাল হয়ে যাবে, এ চিন্তাও রয়েছে। সকাল হলেই ওকে সবাই চিনে ফেলবে। সবচেয়ে বড়ো ঝামেলা তো এই মোটর সাইকেলটা নিয়ে। ভালুকের সঙ্গে একটা মোটর সাইকেল দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে যাবে। কারুর

বুঝতে দেরি হবে না যে ভালুকটা কোন সার্কাস থেকে পালিয়েছে। তখন লোকেরা ওকে ধরে রিংমাস্টারের হাতে সঁপে দেবে। সকাল হতে আর দেরিও নেই।

ও কাঁদতে লাগলো। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর জোরে জোরে।

যে গাছের নিচে ভোলু বসেছিল সেটা বড়ো বড়ো পাতাওয়ালা বিরাট বড়োসড়ো একটা গাছ। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে এই গাছের মাঝখানের এক ডালে একটা পাখি ঘুমোচ্ছিলো। অনেক দূর থেকে উড়ে এসেছে সে। এক নাগাড়ে উড়ে খুবই ক্লান্ত, তবু ভোলুর কান্নায় ওর ঘুম চটে গেল। ও অবশ্য মোটরসাইকেল থামতে দেখেছিলো। তখন ভেবেছিলো ওতে কোনো লোক এসেছে আর বৃষ্টি থেকে বাঁচতে আশ্রয় খুঁজছে। ভোলু তো শুধু যে হেলমেট পরেছে তা নয়, ওর গায়ে জামাও আছে। এই জন্যে ওকে অন্ধকারে চেনা শক্ত। কিন্তু যখন ও কাঁদতে লাগলো পাখিটার সন্দেহে হল। এ কেমন মানুষ যে পশুদের মতো কাঁদে !

পাখি কৌতূহল চাপতে পারে না। আসল ব্যাপারটা কী? মানুষ না হলে মোটর সাইকেল চালিয়ে এল কী করে? নীচে তাকালো, স্পষ্ট কিছু দেখা গেল না। ঘুমে, ক্লান্তিতে ওর আর উৎসাহ হল না যে নীচে গিয়ে দেখে আসে। যা হচ্ছে হোক, সকালে দেখা যাবে। এই ভেবে ও চোখের পাতা বন্ধ করলো। কিন্তু ভোলুর কান্না বন্ধ না হয়ে বাড়তেই লাগলো। পাখির ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে, ঘুমোনই মুশকিল। শেষে ও হাই তুললো, পাখা ঝাপটালো , তারপর পা সোজা করে ফুড়ুৎ করে উড়ে নিচে গেল।

প্রথমে ও কিছুই বুঝতে পারলো না। মনে হল একটা লোক হাঁটুতে মাথা গুঁজে কাঁদছে। পাখি ফিরে এলো নিজের জায়গায়। কান্না চলছে এখনো, কিন্তু সত্যিই তো ঠিক মানুষের আওয়াজ নয়। জানতেই হচ্ছে ব্যাপারটা কি; পাখি কৌতূহলে চঞ্চল হয়ে ওঠে। আবার উড়ে নিচে যায়।

এবার ও খুঁটিয়ে দেখলো। দেখে তো থ। ভালুকের বাচ্চা মানুষের কাপড় পরে আছে, আর পাশে হেলমেট রেখে একনাগাড়ে কেঁদে চলেছে। পাখির মনে হল ও স্বপ্ন দেখছে। নয়তো, এ'ও কি সম্ভব? নিজের পায়ে ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ও দেখলো ও জেগেই রয়েছে, এটা স্বপ্ন হয় । যা দেখছে, সবটাই ঘটনা। কোনোরকমে মনে সাহস এনে জিজ্ঞেস করেই ফেললো,'আরে ভাই, কাঁদছ কেন? তুমি তো একটা ভালুক, তাই না?

ভোলু আরও জোরে কাঁদতে লাগলো।

পাখি ঘাবড়ালো।

'আরে , চুপ করো, চুপ করো, কাঁদছো কেন? হয়েছেটা কি?'



ভোলুর কান্না কিন্তু থামে না। পাখি তো বুঝতেই পারে না ওকে চুপ করায় কী করে। শেষে ওর মাথায় একটা বুদ্ধি খেললো। ও ভোলুর ঠিক সামনে এসে দুলে দুলে নাচতে লাগলো আর মুখে-মুখে একটা গান বানিয়ে গাইতে লাগলো :

টুপি পড়ে এসেছ
মোটরবাইক এনেছ
দেখতে তুমি মোটা বটে
কিন্তু দুষ্টু, ছোট

কিছু তুমি চেপে রাখো—
নইলে চোখে জল কেন?
বাবা কি মেরেছেন,
না কি মা বকেছেন?

গর্জন শুনে ভয় পেয়েছ?
দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চলেছ!
বাড়ির কথা মনে পড়ে?
এখনও মা ঘুম পাড়ান?
বোতল থেকে দুধ খাওয়ান?

কিন্তু এত ছোট থেকো না
আমার কথা একটু শোনো—
বললে কষ্ট ভাগ হয়
দুঃখের দিন কেটে যায়।

গান শুনে ভোলুর কান্নার মধ্যেও হাসি পেয়ে যায়। পাখিও ফিক-ফিক করে হাসে।

ও নিজের পরিচয় দেয়, আমি নবরঙ্গ পাখি। লোকে আমায় পিত্তাও বলে। তুমি তো ভালুক। মনে হচ্ছে পাহাড়ি ভালুক। কিন্তু তুমি শিল্পী। আমি তো জীবনে এই প্রথম কোনো ভালুককে মোটরসাইকেল চালাতে দেখলাম। তাও কতো ছোট তুমি!

পাখিটা খুব বক বক করে। ও ভোলুর অনেক প্রশংসা করলো কিন্তু ভোলু চুপ।

'হ্যাঁ, তাহলে বলো। তুমি কেমন করে মোটরসাইকেল চালাতে শিখলে? আচ্ছা ও কথা থাক। প্রথমে বলো তুমি কাঁদছিলে কেন?'

একথা শুনে ভোলু আবার কান্না শুরু করে। পাখি ফুড়ুৎ করে এসে ওর কাঁধের ওপর বসে আর নিজের ঠোঁট ঘসতে ঘসতে বলে,

'দ্যাখো, ভালো ছেলেরা কাঁদে না। আপাতত ঃ কিছুক্ষণের জন্যে কান্না বন্ধ করো আর বলো তোমার কী হয়েছে। হতেও পারে, যদি আমি তোমার কোনো কাজে লাগি।'

ভোলু ভাবছিলো এই এতটুকু একরত্তি পাখি আমার কী কাজে আসবে। এ কি আর জানে যে আমার শত্রু ঐ রিংমাস্টার যাকে বড়ো-বড়ো বাঘ আর হাতি পর্যন্ত ভয় পায়? তবে ও কিছু বললো না, কেঁদেই চললো।

অনেকবার বলার পরেও কোনো উত্তর না পেয়ে পাখির হল রাগ। বললো, 'তোমার ইচ্ছে, বোলো না কিছু। ভাবছ হয়তো আমি এত ছোট, কী কাজেই বা আসব। ঠিক কি না? মানলাম, আমার দ্বারা কিছু হবে না, কিন্তু কথা বলতে কি? তাতে আর কিছু হোক না হোক, তোমার মন তো ভালো হবে।'

ভোলু তাও চুপ।

'আচ্ছা ভাই, অন্তত কান্না তো বন্ধ করো। আমি ঘুমোতে চললাম। কাল আমায় পাহাড়ে পৌঁছতে হবে। তোমার কান্নায় আমার ঘুম আসছে না। আর কান্না যদি এতই জরুরী সামনের ঐ গাছটার নীচে বসে কাঁদো।'

পাখি যেই উড়ে যেতে যাবে, ভোলু বলে উঠলো, 'কি বললে? তোমায় কোথায় যেতে হবে?'

'আমায় যেতে হবে পাহাড়ের দিকে। মাথায় ঢুকলো? কাল সন্ধ্যের মধ্যে পৌঁছতে হবে। এখন যদি না ঘুমোই কাল সারাদিন উড়ব কি করে?'

'যেতে তো আমাকেও হবে।'

'আগে তুমি কান্না বন্ধ করো, তারপর বলো তোমার সমস্যাটা কি।'

ভোলু এবার সব বললো, কি করে ছোটবেলায় সার্কাসের লোকেরা ওকে জঙ্গল থেকে উঠিয়ে এনেছিলো, কি করে ওকে খেলা শেখানো হতো, কি করে কথায় কথায় ওকে মার খেতে হতো, আর কি করে ওকে গোলু পালাতে সাহায্য করেছে, ওকে জঙ্গলের সেই রাস্তার হদিশ দিয়েছে যেখান থেকে রিংমাস্টার ওকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো।

সব শুনে পাখি বললো, 'ঘাবড়িও না। তুমি যে-জঙ্গলের কথা বলছো আমি সেখানে যাচ্ছি। তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই, আর তুমি যদি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো তাহলে জেনে রাখো আমি তোমাকে ওখানে পৌঁছে দেব। এবার কান্না থামাও।'

'কিন্তু তুমি রাস্তা জানো তো?'

ভোলুর এখনও ওর কথায় বিশ্বাস হয় না।

'জানবো না কেন? খুব ভালো করে জানি। আমার জন্ম তো ওখানেই।' পাখি চায় ওকে ভরসা দিতে।

'তাহলে তুমি এখানে কী করছো?' ভোলু ওর কথায় ভরসা পায় না। ওর মনে হয় পাখিও রাস্তা ভুলে এদিক-ওদিক ঘুরে এখানে এসে পৌঁছেছে।

'আমি এখানে কী করছি? আরে, আমিও তো পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি। ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম নিতে বসে পড়েছিলাম।' পাখির গলায় বিরক্তি।

'তুমি আসছ কোথা থেকে?' ভোলু আবার জিজ্ঞাসা করলো।

'দক্ষিণ দিক থেকে।'

'দক্ষিণ মানে?'

দক্ষিণ, অর্থাৎ যেদিকে সমুদ্র। যদি তুমি পাহাড়ের দিকে না গিয়ে ঠিক উল্টোদিকে যাও তাহলে দিনকয়েক উড়লে যেখানে পৌঁছবে সেই তো দক্ষিণ।

'সমুদ্র কি?' ভোলু নিজের চিন্তা ভুলে পাখির সঙ্গে গল্প শুরু করলো।

সমুদ্র মানে যেখানে শুধু জল আর জল। যেদিকে তাকাও জল ছাড়া আর কিছু নেই।'

'নদীর চেয়েও বেশি?'

'নদীর চেয়ে বহুগুণ বেশি। আমি কতদূর উড়ে যাই তবু জলের শেষ দেখি না।'

'তুমি ওখানে কি করতে গিয়েছিলে?'

'তুমি পৌঁছতেও চাও নাকি শুধু গল্প করলেই চলবে?' পাখি হাসি হাসি মুখে বললো।

এবার ভোলু ঘাবড়ালো : 'আরে হ্যাঁ হ্যাঁ। বলো কীভাবে যাবো। সকাল তো হল বলে। এবার কী করবো?'

পাখির মনে হল ভোলু আবার কাঁদতে শুরু করবে। ও বললো, 'ঘাবড়িও না, আমি একটু ভেবে দেখি।'

পাখি ভাবতে লাগলো। ভোলু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর মন ছটফট করছে। যদিও পাখির ওপর খুব একটা ভরসা নেই ওর, তবু এখন এতই নিরুপায় ও যে খড়কুটো পেলে ও আঁকড়ে ধরে অগত্যা ....পাখি বললো, 'দ্যাখো, রাস্তা তো সোজা। এখান থেকে কাশীপুর দূর নয়। সকাল হওয়ার আগেই আমরা শহর ছাড়িয়ে যেতে পারি। আমি তোমার মোটরসাইকেলের সঙ্গে সঙ্গে যাব। সকাল হলেই মোটরসাইকেল কোথাও রেখে তুমি লুকিয়ে যেও। আমি পাশেই কোনো গাছে বসে সব কিছুর ওপর লক্ষ্য রাখব। কেউ এলে সঙ্গে সঙ্গে তোমায় বলে দেব, তুমি সাবধান হয়ে যাবে।'

'আরে, যা বলছি তাকি কানে যাচ্ছে না?' ভোলু বলে ওঠে 'দেখছো তো মোটরসাইকেল চলছে না। চললে আর চিন্তা কি ছিলো? 'কেন, কী হল?'

'কে জানে কি হয়েছে!' ভোলু বিরক্ত হয়ে বললো।

'তাহলে তো আরো কিছু ভাবতে হয় দেখছি।' পাখি আবার ভাবতে বসলো।

ভোলুর মনে এখন প্রচন্ড ভয়। রেগে বললো, 'তুমি বসে বসে ভাবতেই থাকবে না কিছু করবে? এদিকে সকাল হয়ে এলো। এবার লোকজনের চলাফেরা শুরু হবে। সার্কাসেরও কেউ এসে যেতে পারে, আর সে তো আমাকে চিনে ফেলবে। তোমার আর কি! তুমি তো গাছে উঠে বসে থাকবে। ধরা তো পড়বো আমিই, না।

ওর ভয় দেখে পাখির হাসি পেল। বললো, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। বেশি ভাববো না, তবে এবার কি ভেবেছি বলছি।

'তাড়াতাড়ি বলো না! কই, কী বলছো?' ভোলু থাকতে না পেরে উঠে দাঁড়ালো।

'প্রথমে তুমি মোটর সাইকেলটাকে রাস্তা থেকে অনেক দূরে রেখে এসো যাতে ওটা কারো চোখে না পড়ে। সার্কাসের লোকজন এলেও ওরা সহজে বুঝতে পারবে না যে ভালুক এদিকেই এসেছে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে': এই বলে ভোলু মোটর সাইকেলের চাকা ধরে টানাটানি শুরু করলো।

'আরে ওটাকে তুলে নিয়ে যাও না!'

ভোলু এ-কথার কোনো জবাব না দিয়ে মোটরসাইকেলটা টানতে টানতে একটা ঝোপের পেছনে নিয়ে গিয়ে তবে থামলো।

পাখি বলে,'তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? স্থির মাথায় কাজ করো। এখনো সকাল হতে দেরি আছে।'

'তুমি তার আর বুঝবে কি! এই মোটর সাইকেল যে কি ঝামেলার !একে সোজা করে দাঁড় করানো চাট্টিখানি কথা নয়।'

পাখি চুপ করে আছে দেখে ভোলু আবার বললো, 'আচ্ছা বলো, এবার কি করতে হবে।'

এবার তোমায় রাস্তা ছেড়ে মেঠো পথে চলতে হবে। এতে কারো নজর পড়বে না তোমার ওপর। আমি কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে আগে যেতে থাকব। কোনো বিপদ বুঝলে জোরে দুবার আওয়াজ দেব: টিব টিব। পাখি শিস দিয়ে আওয়াজটা বুঝিয়ে দিল। তুমি লুকোনোর জায়গা পেলেই লুকিয়ে পড়বে। বিপদ কেটে গেলে ঐ আওয়াজই দেব, এবার কিন্তু একবার। তুমি বেরিয়ে এসে আবার এগোতে থাকবে। মাথায় ঢুকলো মতলবটা?



ভোলু মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলো সে বুঝেছে।

ওরা যেতে শুরু করলো। ভোলু রাস্তা থেকে নেমে খানিকটা দূরে-দূরে চলেছে আর ন-রঙা পাখি চলেছে খানিকটা ওপর দিয়ে উড়ে উড়ে রাস্তার সমান্তরাল, ভোলুর চেয়ে একটু এগিয়ে।

মেঘে ঢাকা আকাশ। ঘন অন্ধকার। অন্ধকারে চলার অভ্যেস ভোলুর আর নেই। ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া ওর ভয় পাখিকে যদি আর না দেখতে পায়। ওই তো একমাত্র ভরসা। ওকে হারালে চলবে না। ভোলু চলেছে মাঠের মধ্যে দিয়ে কিন্তু দৃষ্টি ওর আকাশের দিকে। হঠাৎ ওর পা গেল ফসকে। সামলাতে না পরে ঝপাৎ করে জলে ভর্তি এক গর্তে গিয়ে পড়লো।

ভয়ে চিৎকার করে উঠলো 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

পাখি খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলো। চিৎকার শুনে তাড়াতাড়ি ফিরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলো না। বুঝতেই পারে না ভালুকটা আসলে গেল কোথায়!

হাঁক পাড়তে লাগলো, 'কোথায় গো তুমি, ও মোটরসাইকেলওয়ালা ভালুক!'

এর মধ্যে ভালুক তিনবার ডুব দিয়েছে। ঠান্ডায় আর মুখের মধ্যে জল ঢুকে যাওয়ার ওর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না।

পাখি তো ভয়ে আর দুশ্চিন্তায় কাঁটা। ও বারবার চিৎকার করে, 'কোথায় গেলে তুমি? ও ভালুক, ও মোটরসাইকেলওয়ালা ভালুক!'

রাতের নীরবতা ছিন্নভিন্ন করে পাখির তীব্র চিৎকার শোনা যায় অনেক দূর পর্যন্ত। পাখির এই চিৎকার ভোলুকে আরও ঘাবড়ে দেয়। ওর মনে হয় এতেই ও ধরা পড়ে যাবে।

কোনোরকমে থু-থু করে মুখের মাটি ফেলে দিয়ে, ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে, যতোটা জোরে পারে ভোলু বলে ওঠে, 'এই যে আমি এখানে।'

ওর আওয়াজ পেয়েই পাখি এক সেকেন্ডে ওর কাছে পৌঁছে যায়। ভোলুর অবস্থা দেখে ওর খুব হাসি পায়। যতো দ্যাখে, ততো হাসে, হেসে আর কূল পায় না।

ভোলু মনে মনে খুব রেগে যায়। কিন্তু এখন তো ওর কিছু করার উপায় নেই। ঠান্ডাও লাগছে খুব। কাদায় গেছে আটকে। যতো চেষ্টা করে বেরোতে তত বেশি আটকে যায়।

পাখি হাসতে হাসতে বলে, 'এ কি অবস্থা?'

ভালুক ওর কথার উত্তর দেয় না। পাখি বোঝে ওর হাসি ভালুকের পছন্দ নয়।

'আচ্ছা, ক্ষমা চাইছি বাবা, আমার হাসা উচিত হয়নি। আসলে ভিজে গিয়ে তুমি খুব রোগা লাগছো আর কাদায় তোমার রঙও গেছে বদলে। মনে হচ্ছে জলের মধ্যে একটা শুকনো গাছের ডাল। আমার দেখেই হাসি পেয়ে গেছে। আমার জায়গায় তুমি হলে তোমারও হাসি পেত। কিন্তু এই জলের মধ্যে কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? বেরিয়ে আসছো না কেন?'

পাখির এই কথা শুনে ভোলুর চোখে জল এসে গেল।

'বেরোই কি করে? আমার চারটে হাতই তো কাদায় আটকে আছে।'

ওর কান্না কান্না গলা শুনে পাখির দুঃখ হল।

চট করে ওর কাছে চলে এসে পাখি ব্যাপারটা দেখলো। বললো 'ভয়ের কিছু নেই। এক কাজ করো। আগে আস্তে আস্তে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও। তারপর কোনোরকমে সামনের গাছের যে-ডালটা ঝুলছে সেটাকে ধরো। তুমি হাত পেয়ে যাবে। খুবই নিচে। তারপর ওটা ধরে বাইরে বেরিয়ে এসো।'

ভোলু ওর কথা শুনে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। চেষ্টা করে কোনোরকমে গাছের একটা ডাল ধরে ফেললো। কাছেই ছিলো ডালটা। বুদ্ধিটা কাজে দিলো। পাখি ঠিকই বলেছিলো। ভোলু অনায়াসে জলকাদা থেকে বেরিয়ে এলো।



শহরের কুকুরগুলো

ভোলু ঠান্ডায় কাঁপছিলো কিন্তু থামেনি কোথাও। দুজনে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। হাঁটতে হাঁটতে ভোলুর শীত-করা কমে এলো; এখন ও বেশ স্বাভাবিক।

ও ভাবলো, পাখিটা ভালো কিন্তু দায়িত্বহীন।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলো, 'তুমি আমাকে মোটরসাইকেলওয়ালা ভালুক বলে কেন ডাকছিলে? তুমি কি চাও আমি ধরা পড়ি?'

এ-কথা শুনে পাখি কি বলবে ভেবে পায় না। কি যে বলো তুমি! আরে এই যদি চাইতাম যে তুমি ধরা পড়ো তাহলে পালানোর পথের সন্ধান দিতাম কেন?

ভোলুর রাগ পড়ে না। বলে,'কিন্তু আমাকে তুমি মোটরসাইকেলওয়ালা ভালুক বলবে কেন?'

'তোমার নাম তো জানি না। বলেছ তুমি নিজের নাম? ধরো যদি ডাকতাম "কোথায় গো ভালুক ভাই," আর তোমার বদলে অন্য এক ভালুক চলে আসতো, তখন কী করতাম? এখানে আরো ভালুক তো থাকতে পারে!'

'তা নয় আর! সব ভালুক যেন এখানেই এসে জড়ো হয়েছে! যেমন কথা তোমার! অন্য ভালুক এখানে কোথা থেকে আসবে?"

ভোলুর রাগ যায় না।

'আর ভাই, তুমি কীই বা জানো! এ রাস্তায় আমার নিত্য যাওয়া-আসা। জঙ্গল তো বেশি দূর নয়! প্রায়ই পশুরা রাস্তা ভুলে চলে আসে। ভালুক তো ভালুক, একবার ঠিক এই জায়গায় আমার কাছে এক বাঘ রাস্তার হদিশ চাইছিলো।' কথায় ভোলুকে মাৎ করার চেষ্টা করে পাখি। কিন্তু ও হারবে কেন? 'আচ্ছা, মানলাম, ভালুক তো কোন ছার, বাঘ সিংহ হাতি সব আসে। কিন্তু তুমি মোটরসাইকেল

মোটরসাইকেল বলে চ্যাঁচাচ্ছিলে কেন? পশুদের কথা ছাড়ো, সার্কাসের কোনো লোক যদি শোনে "মোটরসাইকেলওয়ালা ভালুক" তাহলে তো আমার হয়ে গেল! পাখি হাসে। বলে, 'তুমি নেহাৎ-ই শিশু। কথাও তোমার তেমনি। আরে বাবা, মানুষ আমাদের ভাষা বুঝবে কি করে? ওরা বুঝবে কি করে আমি কি বলছি?'

ভোলুর সেই এক কথা। 'সার্কাসের লোকদের বিশ্বাস নেই। তুমি ওদের চেনো না। ওরা সব কিছু বুঝতে পারে। জঙ্গলের রাজা বাঘ ওদের কাছে কেমন করে থাকে জানো? জঙ্গলের মধ্যে বাঘকে দেখে হরিণও বোধহয় এত ভয় পায় না।'

'আচ্ছা বাবা, কান মলছি, আর আমি মোটরসাইকেলের নামও নেব না। কিন্তু মশাই নিজের নামটা বলুন এবার!'

নাম বলতে ভোলুর কী গর্ব! 'আমার নাম ভোলু। মানুষের মতো নাম; বুঝেছ?'

'হ্যাঁ বুঝেছি ;কিন্তু তুমি মানুষের চেয়ে কম কিসে? ওদের মতো মোটরসাইকেল চালাতে পারো, ওদের মতো জামা পরো ।এ কি কম কথা? কি বলো!' পাখি খিলখিল কবে হেসে ওঠে।

ওর হাসিতে ভোলুর আবার রাগ। 'এতে হাসির কি আছে?'

'এমন কিছু হাসির ব্যাপার নয়, শুধু এই যে মানুষের নাম রাখলে কি কোনো পশু মানুষ হয়ে যায়?' পাখি এখনও হাসছে।

'মানে?'

'বলতে পারো তুমি এই জামা পরেছ কেন? এতে কি লোকে বুঝবে না যে তুমি মানুষের পোষা? তা ছাড়া জামাটা ভিজেও তো গেছে। এটা পরে থাকলে ঠান্ডা লাগতে পারে।'

ভোলু বুঝলো কাজটা ঠিক হয়নি। না বলতেই জামাটা খুলে ফেলে দিলো। তারপর ওরা আবার চুপচাপ এগোয়। হঠাৎ ভোলুর মনে পড়লো এর নাম তো জানা হয়নি। বললো, 'আচ্ছা, তোমার নাম কি?'

'বলেছিলাম না, আমাকে লোকে নবরঙ পাখি বলে। মা অবশ্য নাম রেখেছিলো একটা : "বিদঘুটি"। পাখি হাসতে হাসতে বলে চলেছে,'মা বলতো আমার কোনো কাজের ছিরি ছাঁদ নেই। দেখছ না, আমার কথায় তোমার কতো রাগ হচ্ছে! সাবাই আমার কথায় রেগে যায়।'

এবার ভোলু না হেসে পারে না। বলে, 'আমি তোমায় বিদঘুটি বলতে পারবো না। আমি তোমায় নবরঙ্গী বলবো।'

পাখি ঠাট্টা করে বলে, 'এখানে যদি আর একটা ন-রঙা পাখি এসে যায়, তাহলে?'

'তাহলে আমি তোমাকে নবরঙ্গীদিদি বলবো।' একটু ভেবে ভোলু বলে, 'নবরঙ্গী বলার কী দরকার? তোমাকে শুধু দিদি বলবো।'

এ-কথায় পাখি আহ্লাদে আটখানা।

কিছু দূর এগিয়েছে কি, ভোলু হঠাৎ থম মেরে দাঁড়িয়ে পড়লো। ওর মুখে আর হাসি নেই। কান খাড়া করে কি যে শুনছে। পাখি এরই মধ্যে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলো। কিছুক্ষণ পরে যখন বুঝলো ভোলু আবার কোথাও আটকেছে, ও ফিরে এলো। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো,'কী হল ভোলু?'

'শুনছো না?' ভোলু ফিসফিসিয়ে বলে।

পাখিও ওর মতো ফিসফিসিয়ে ওঠে,'কী?'

ভোলু নট নড়নচড়ন। 'শোনো'। পাখি কানা পাতলো কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলো না। নিরাশ হয়ে বললো,'কই, আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না।'

'কি বলছো? কানে যাচ্ছে না? কুকুর! কুকুর ডাকছে।' ভোলুর চোখে-মুখে আতঙ্ক।

'তাতে কি হল?' পাখির মাথায় কিছু ঢোকে না। কুকুর তো ডাকেই। ডাকতে দাও। আমাদের কি করবে?'

'তুমি তো আকাশে উড়ে বেড়াও, তুমি আর কি বুঝবে? মাটিতে চলতে যদি, বুঝতে কুকুর কি করে। আমাকে একবার দেখতে পেলেই হল ; বুঝেছ। ভোলুর সেই এক কথা।

পাখি বুঝলো সমস্যাটা। কি করা যায় ভাবছে। এমন সময় ভোলু আবার ফিস ফিস করে উঠলো, 'এই নচ্ছার কুকুরগুলো এলো কোথা থেকে।

পাখি সঙ্গে সঙ্গে বললো,'মনে হচ্ছে সামনে কোনো বসতি আছে।'

'কেমন বসতি?' ভোলু তো ভয়ে ফ্যাকাসে

'বসতি আর কি, কাশীপুর শহরই এসে গেল। তুমি আরও একটু সরে গিয়ে লুকিয়ে থাকো। আমি দেখে শুনে আসছি। ঐ ঝোপটার মধ্যে লুকোও আমি যতোক্ষণ না ফিরছি একটু নড়বে চড়বেও না।'

যেদিক থেকে কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছিলো পাখি সেদিকে যতো তাড়াতাড়ি পারে উড়ে গেল।

ভোলুকে বেশি অপেক্ষা করতে হল না। পাখি তক্ষুণি ফিরে এলো। ও খুব হাঁফাচ্ছে। আর এদিকে ভোলু পরিস্থিতি জানবার জন্যে ব্যাকুল।

পাখি হাঁফিয়েই চলেছে।

'কি হলো শেষ পর্যন্ত ?' ভোলু আবার বলে।



কোনোরকমে পাখি বললো,'দাঁড়াও, বলছি।'

এক-এক মুহূর্ত ভোলুর মনে হয় কতো দীর্ঘ সময়।

কোনোরকমে পাখি দম ফিরে পেলো। বলতে লাগলো, 'হ্যাঁ, এটা কাশীপুরই। রাস্তাটা গেছে শহরের মাঝ বরাবর। তুমি ঠিকই বলছিলে। শহরটায় কুকুরের ছড়াছড়ি। তাছাড়া মনে হচ্ছে সকাল হয়ে এলো। এবার লোকেরা জাগবে। শহরের মাঝখান দিয়ে তো কিছুতেই যাওয়া চলবে না। মানুষ যদি না' ও জাগে, কুকুরের দল তোমাকে বেরোতে দেবে না। তাছাড়া শহরে আলোও খুব।'

'কি হবে এখন?' ভয়ে ভোলু কাঁপে।

'এবার আমাদের শহর এড়িয়ে চলতে হবে। রাস্তা ধরে আর কিছু দূর মাত্র যাওয়া চলে। তারপর রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকে যাব, আর তারপর ঘুরপথে বেরিয়ে যাব। ক্ষেত ধরে যাবো। তাও শুধু অন্ধকারে। রাস্তা আমি চিনে নিয়েছি। মাঝখানে একটা নির্জন জায়গা আছে। সেখানে গা-ঢাকা দেওয়া যেতে পারে।'



দুপুরের খাওয়া

এক কিলোমিটার গিয়েই ওরা বড় রাস্তা ছেড়ে দিলো। এবার চলা শহরের বাঁদিকে, যেদিকে শুধু গাছ আর গাছ, কতো ঝোপঝাড়। শহর সরে যায় দূর থেকে দূরে। তা হোক, মাঝে মাঝে গ্রাম তো আছেই। সকাল হয় ধীরে ধীরে। এক-আধ জন কৃষকের চলাফেরা চোখে পড়ে। সকলের চোখ এড়িয়ে চলতে ভোলুর বেশ অসুবিধে।

শেষে ভোলুকে বলতেই হয়, 'দিদি, দ্যাখো না চারিদিকে কতো আলো হয়ে গেছে! কেউ না আবার দেখে ফেলে!'

পাখি চট করে কাছে এসে বলে, 'আর এগোনো যাবে না। মাঝ বরাবর এক গ্রাম আছে আর তাকে নিয়ে ফসলের খেত। ওখান থেকে বেরোতে গেলে চোখে পড়ে যাওয়ার বিপদ খুবই।'

'তবে কি করবো?' ভোলু ছটফট করে ওঠে।

'এখানে ঘন ঝোপ। দিনটা এখানেই কাটাতে হবে। তুই একটা ভালো জায়গা খুঁজে নিয়ে সেঁধিয়ে যা। আমি কাছেই কোনো বড়ো গাছে বসে থাকব। আর সেখান থেকেই তোর ওপর লক্ষ্য রাখব। তবে হ্যাঁ, তুই আমার শিসের আওয়াজটা মনে রাখিস। বিপদ বুঝলে সঙ্গে-সঙ্গে আওয়াজ দেব; বুঝলি তো?'

ভোলুর এখনও ভয় কমেনি। কিন্তু ও এখন বড়ই ক্লান্ত। পাখির কথামতো ও এক ঘন ঝোপের ভেতর গিয়ে বসলো। আর পাখি নিজের জায়গা বাছলো সবচেয়ে উঁচু গাছের সবেচেয়ে উঁচু ডালে। ওখানে বসে মাইলের পর মাইল দেখা যায়।

ঐ ডালের ওপর পাখা ছড়িয়ে পাখি আরাম করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ক্লান্তি কমলে ওর জোর খিদে পায়। ভাবে, খিদে তো ভোলুরও পাবার কথা। আমি তো যখন খুশি যা-খুশি খেতে পারি, কিন্তু সমস্যা তো ভোলুকে নিয়ে। এক তো ও সহজে কিছু পাবে না, আর তাছাড়া ওর কোথাও যাবার উপায় নেই। তবে হয়তো আশপাশে

ঘুরলে ওর জন্যে কিছু জোগাড় করা যায়। ডানা মেলে ও তখুনি চললো খাবারের খোঁজে।

পাখিকে বেশি এদিক ওদিক ঘুরতে হয়নি। কাছেই ছিলো এক বাগান। তাতে আম লিচু আর কাঁঠালের কিছু গাছ ছিলো। আম আর লিচু এখন খুবই ছোট। কাঁঠালও কাঁচা তবে ওতে ভোলুর খিদে মিটতে পারে। পাখি খুব মন দিয়ে দেখলো। খুশি হল, কেন না ওখানে কেউ কোথাও নেই।

পাখি উড়ে চলে এলো ভোলুর কাছে। ভোলু তখন হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে। পাখি কয়েকবার ডাকলো, 'ও ভোলুমশাই! কই গো ভোলু ভাই! ও মোটরসাইকেলওয়ালা ভোলু মশাই!'

কিন্তু ভোলুর ঘুম এত গভীর যে ভাঙেই না। শেষ পর্যন্ত পাখির মাথায় এক রসিকতা এলো। ও উড়ে ভোলুর কাঁধে গিয়ে বসলো। তারপর ওর কানের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগলো।

শুরুতে তো কোনো লাভই হল না এতে। তখন পাখি আরো জোরে জোরে খোঁচাতে লাগলো। ভোলু ঘুমের ঘোরে হঠাৎ এত জোরে হাত চালালো যে পাখি তো দূরে ছিটকে গিয়ে পড়লো। ভাগ্য ভালো যে চারিদিকে ঝোপঝাড় ছিলো, নইলে মাথা ফেটে যেত। রসিকতা করার মজা বেরিয়ে যেত।

পেরে না উঠে পাখি ভাবলো, যাক, ঘুমোচ্ছে তো ঘুমোক। মার খেয়ে ওর সম্বিৎ ফিরেছে। ও ফিরে এল গাছের ডালে।

ভোলু তখন গভীর ঘুমে এক দারুণ স্বপ্ন দেখছে।

এদিকে খিদের জ্বালায় পাখির অবস্থা খারাপ। ও এ-পাশ ও-পাশ করে কিন্তু ঘুম আসতে চায় না। মাঝে মাঝে নীচে গিয়ে ভোলুকে দেখে আসে। ওকে জাগাবার সাহস আর নেই। কিন্তু একা-একা খেতেও ওর ভালো লাগছে না। দুজনে একই সঙ্গে এসেছে আর ভোলুও তো কিছু খায়নি।

বেলা দুপুর। রোদ খুব চড়া। বেশ গরম লাগছে। অবশেষে পাখিরও একটু তন্দ্রা এলো। হঠাৎ ওর মনে হল ভোলু যেখানে শুয়ে আছে সেখানে কিসের যেন হট্টগোল। পাখির ঘুম তৎক্ষণে হাওয়া। ও কান খাড়া করে বোঝবার চেষ্টা করলো ব্যাপারটা কি। সত্যিই তো ওখানে চ্যাঁচামেচি হচ্চে!

পাখি ভাবলো, হয়তো ভোলুর ঘুম ভেঙেছে। ও তাড়াতাড়ি উড়ে ওখানে পৌঁছালো। ভোলু মশাই তখন আড়মোড়া ভাঙছেন।

ব্যঙ্গের সুরে পাখি বলে, 'কি? খুব ঘুম হলো?'

ভোলু হাসলো। কিন্তু এখন যে বেজায় খিদে ...

'খুব ঘুমোও, খিদে টিদে পরে হবে। আমি তো খিদের জ্বালায় মরছি। তুমি এদিকে ঘুমিয়েই চলেছ। আমি তোমাকে জাগাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি ;তা জানো ? কিন্তু কোনোফল হয়নি। বরং তোমার জন্যে প্রাণটা প্রায় গিয়েছিলো, আর কি । ভাগ্য ভলো যে বেঁচে গিয়েছি।'

'কেমন করে ?' ভোলুর ভয়ার্ত প্রশ্ন। ও ভাবলো কোনো সার্কাসওয়ালার হাতে পড়তে পড়তে বাঁচেনি তো!

'চেঁচিয়ে যখন কোনো ফল হল না, তখন আমি তোমার কানের কাছে এসে জাগাবার চেষ্টা করলাম। ওঠার বদলে এত জোরে হাত চালালে যে আমার ঘাড় ভাঙতে-ভাঙতে বাঁচলো। এখনও ব্যথা করছে ।' পাখি নিজের ঘাড়ে হাত বুলোতে-বুলোতে বললো।

ভোলু লজ্জা পেল। অনেকক্ষণ ধরে নিজের সাফাই গাইলো আর ওর কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলো।

পাখি বললো, ছাড়ো, যা হয়েছে, হয়েছে। তোমার হাত থেকে তো বেঁচেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে খিদের জ্বালায় মরে যাব। এবার আমার কথা শোনো : এখান থেকে খানিক দূরে একটা বাগান আছে ; সেখানে নানা রকম ফলে গাছ ভর্তি। কাছাকাছি কোনো লোকও নেই। চলো ওখানে যাই। তুমিও খাবে, আমিও খাবো। ঠিক আছে ?'

ফলের নাম শুনেই ভোলুর জিভে জল। তাছাড়া খিদেও পেয়েছে খুব। তবে ও একথাও ভোলেনি যে এই দুপুরবেলা বাইরে বেরোনো ওর পক্ষে বিপজ্জনক। ও সঙ্গে-সঙ্গে বললো, 'না বাবা না, ফলের নিকুচি করেছে।

আমি এখান থেকে কোথাও যাব না;না-খেয়ে মরতে হয় মরবো কিন্তু দুপুরবেলা বাইরে বেরোবে না।'

পাখি রেগে উঠলে : 'তবে খাবেটা কি ? আমার মাথা ?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে । আমি বেশ আছি। যা হয়ে যাক, আমি রাতের আগে এখান থেকে নড়ছি না। মানুষের ব্যাপারে কোনো ভরসা নেই, কখন যে কোথায় এসে পড়ে!' ভোলু এমন করে গুটিয়ে বসে পড়লো যেন পাখি ওকে ঘাড় ধরে এখান থেকে জোর করে বাইরে নিয়ে যাবে।

পাখি বুঝলো ব্যাপারটা। ভোলু বড় বেশি ভয় পেয়েছে ।হতে পারে ভয়টা ঠিকই। তবে ওকে কিছু খেতে তো হবে। এখনও সারাটা দিন পড়ে রয়েছে । কি করে কাটাবে? ও ভোলুকে বোঝাবার চেষ্টা করলো : 'আমি আর একবার চরিদিক দেখে আসি। যদি দেখি বিপদ নেই তবেই আমরা যাব।

কিন্তু ভোলু নড়ার পাত্র নয়। বলে, 'তুমি খেয়ে এস, আমি ঠিক আছি।'



পাখি বুঝতেই পারছে না এখন কী করে। ওর একলা খাওয়াটা ঠিক নয় অথচ ভোলু তো নড়বেই না। কিন্তু ও-ই বা খিদে নিয়ে কতক্ষণ থাকবে! ভোলুর কাছে হার মেনে ও খাওয়ার খোঁজে বেরোলো।

এদিকে ভোলু পেট চেপে পড়ে রইলো আর ভাবতে লাগলো অন্ধকার হতে আর কতো দেরি। যতোই আন্দাজ করার চেষ্টা করে একটা কথা বুঝতে পারে, দিন শেষ হতে অনেক দেরি। ও বুঝতেই পারছে না করবেটা কি এখন। হঠাৎ শোনে পাখির ডানার শব্দ। পাখি ফিরে এসেছে।

'কি হল?' ভোলু ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

পাখি বলে,'কাছেই কুলাগাছের ঝোপ। বেশি দূর যেতে হবে না। কমই কুল বেঁচেছে তবে তোমার কাজ হয়ে যাবে। চলো, ওঠো।'

ভোলু নড়বে না। শুয়ে শুয়েই বলে, 'বলছি না, আমার খিদে নেই। তুমি নিশ্চিন্তে খেয়ে এসো।'

পাখির এবার রাগ হল। বললো, 'তুমি বেশ বোকা। আরে, দু পা'ও যেতে হবে না আর ওখানে তোমায় কেউ দেখবে না। আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না, না? চলো, ওঠো।'

তাও ভোলু নড়ার নাম করে না। সেই এক জেদ, ওর খিদে নেই, পাখি খেয়ে আসুক।

পখির রাগ বাড়ে। বলে,'ঠিক আছে, আমি খেতে চললাম। তারপর ওখান থেকেই চলে যাব। আমাকে যদি একাই যেতে হয় তবে তোমার কাছে ফিরে কি লাভ?

এবার ভোলু ঘাবড়ালো। পাখি চলে গেলে তো ও অকূল পাথারে! মনমরা হয়ে ভোলু উঠলো আর পাখির সঙ্গে যেতে শুরু করলো।

সত্যি,কুলের ঝোপ দু-পা গেলেই! তবে কুলের সময় শেষ হয়েছে, কুল শুকোতে শুরু করেছে। তবু খিদের জ্বালায় ঐ শুকনো কুল যেন অমৃত। তাড়াতাড়িতে ভোলু কুলের আঁটিও গিলে ফেললো আর যতো তাড়াতাড়ি পারে নিজের জায়গায় ফিরে এলো।

পেট একটু ভরেছে, তাই ওর আবার ঘুম এসে গেল। সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘুমিয়েই কাটালো। কিন্তু নবরঙ পাখি এক মুহূর্তও ঘুমোয়নি। ভোলুর দায়িত্ব ওরই কি না!



ভোলুর স্বপ্ন

সন্ধ্যে হওয়ার আগেই পাখি সব রাস্তাঘাট দেখে নিলো আর অন্ধকার নামতেই দুজনে বেরিয়ে পড়লো। শহর এড়াতে ওদের অনেক ঘুর পথে যেতে হল, তবু মাঝরাতের আগেই ওরা শহরের আর এক প্রান্তে গিয়ে পৌঁছালো।

শহর ছাড়িয়ে ওরা এখন দু কিলোমিটার এগিয়ে। এবার সোজা রাস্তা পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। পাখি বললো,'ভোলু মশাই, আর তো আমাদের বিপদ নেই।'

'আর কতদূর যেতে হবে?' ভোলু জানতে চায়।

'ক্লান্ত?' পাখি হেসে বলে।

ভোলু কিছু বলার আগেই আবার বলে ওঠে,'আর বেশি দূর হওয়ার কথা নয়। এই সেই রাস্তা যেটা বনের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। তবে রাস্তায় আর একটা শহর পড়বে। সেটা পার হলেই জঙ্গল শুরু।

'আরও একটা শহর?' ভোলু যেন আর পারে না।

'চিন্তা নেই, খুব ছোট শহর' : পাখি ওকে সাহস দিতে চায়। ভোলু নিস্তেজ গলায় বলে, 'শহরটার নাম কি?'

'রামনগর'। পাখির মনে হল ভোলু শুধু-শুধু হতাশ হচ্ছে। ও তো ওকে হতাশ করতে চায়নি। বললো, চিন্তার কিছু নেই, একটু জোরে হাটলে আমরা সকাল হওয়ার আগেই শহর পেরিয়ে যাব। এমনিতে তো এখন আমাদের রাস্তার ধার ঘেঁসেই চলতে হবে, তাই এ চলা খুব একটা শক্ত কাজ না।

ভোলু বলে,'ঠিক আছে, আমি তাড়াতাড়ি হাঁটবো; হাঁটতে আমার কোনো অসুবিধে নেই।'

দুপুরের স্বপ্নটা মনে পড়ে যায় ভোলুর। হেসে বলে, 'আজ আমি এক মজার স্বপ্ন দেখেছি।'

'কি স্বপ্ন?'

'আমি দেখলাম তুমি আর আমি একসঙ্গে উড়ছি। নীচে রিংমাস্টার দৌড়চ্ছে আমাদের ধরবার জন্যে। আমরা যতো উড়ি ও ততো দৌড়য়। দৌড়তে-দৌড়তে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ও পড়ে গেল আর আমরা উড়তে উড়তে এগিয়ে গেলাম। তারপর এমন জায়গায় এসে পৌঁছলাম যেখানে চারিদিকে শুধু জল, ঠিক যেমনটি তুমি বলেছিলে। ওটাই বোধহয় সমুদ্র। সেটা পেরিয়ে এবার আমরা এমন এক জায়গায় এলাম যেখানে শুধুই সবুজ জঙ্গল। সেই জঙ্গল নানা রকমের পশুপাখির বাস। তারা আমাদের খুব যত্ন আত্তি করলো, ওখানেই থেকে যেতে বললো। সে শুধু পাশুপাখির দেশ, মানুষ একটাও নেই। মজার ব্যাপার, তাই না?'

পাখি হাসে : 'হ্যাঁ, স্বপ্নটা তো বেস মজার। তুমি যদি সত্যি উড়তে পারতে কি মজাই না হতো! এতক্ষণে কোথায় না আমরা চলে যেতাম!'



পাখির একটা কথা মনে হল। বললো,'কিন্তু তুমি বিনা ডানায় উড়ছিলে কি করে?

'ঠিক তোমার মতো, যেমন তুমি ওড়ো। আমার সামনের পা দুটো হয়ে গিয়েছিলো ডানা, আর আমি সেই ডানা চালাচ্ছিলাম ঠিক যেমন তুমি করো। আমাকে দেখে নিচে যত লোক ছিলো আশ্চর্য হয়ে চিৎকার করছিল : "উড়ন্ত ভালুক! উড়ন্ত ভালুক।" আমি সে কী রাজাই চালে উড়ে চলেছি! উড়তে তো বড়ো মজা লাগে। ওপর থেকে সব জিনিস বড়ো সুন্দর দেখায়, তাই না?'

'হ্যাঁ, ওড়ার মজাই আলাদা।'

'তুমি আমাকে ওড়া শিখিয়ে দেবে?'

পাখির হাসি পায়। তবু বলে, 'ওড়া কি করে শেখাব তোমায়?

ওড়ার জন্যে ডানা চাই, তাই না?'

'যদি আমি সামনের পা দুটো ডানার মতো চালাতে পারি, তাহলে হয়তো উড়তে পারি।'

পাখি কিছু বলে না।

ভোলু বলতেই থাকে,'আচ্ছা, আমি কোনো গাছের মগডালে যদি উঠে যাই আর সেখান থেকে চেষ্টা করি, হয়তো উড়তে পারবো। তোমার কী মনে হয়?

পাখি আর চুপ করে থাকতে পারে না। বলে, 'ভাইটি আমার, এমন বোকামি করে বোসো না যেন। যার ডানা থাকে সেই উড়তে পারে। যদি আমাদের ডানা না থাকতো, আমরাও উড়তে পারতাম না।'



প্রথম ওড়া

পাখির মনে পড়লো, দিনের বেলা ভোলুর ঠিক মতো খাওয়া হয়নি। ও বললো, 'এখান থেকে কিছু দূরে একটা বাগান আছে। ওখানে তুমি কিছু-না-কিছু খাবার পেয়েই যাবে। তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।'

খিদের নামেই ভোলু আর থাকতে পারে না। স্বপ্নের উড়ে-বেড়ানো ভুলে ও যেন মাটিতে নেমে এলো। ও খুব বিনয়ের সঙ্গে বললো, 'বাগানটা কতো দূরে?'

'কাছেই। আমি তোমায় বলে দেব। একটু ডান দিক ঘেঁষে। রাস্তা পার করতে হবে। যখন বলবো,করবে।'

'ঠিক আছে,'ভোলু মাথা নাড়ে। নিজে থেকেই যেন ওর গতি বেড়ে গেল।

সত্যিই বাগানটা বেশি দূরে নয়। ওখানে আম লিচু এবং আরও নানারকম ফলের গাছ। ভোলু খাওয়া শুরু করে দেয়। যাবার সময় বেশ কিছু ফল সঙ্গে নিয়ে নেয়।

পাখি ওকে দেখে হাসে কিন্তু কিছু বলে না।

পেট ভরার পর ভোলুর বুদ্ধি খোলে। বলে,'আচ্ছা, একটা কথা বলো : তুমি এত কিছু জানলে কি করে?'

'কতো কিছু?' পাখি হেসে জিজ্ঞেস করে।

'এই যে এখানে বাগান আছে, ওখানে শহর আছে, ওখানে গ্রাম, শহর এত দূর, এই সব। তোমার তো ভারি বুদ্ধি!'

'শোনো কথা, এতে বুদ্ধির কি হল! আমি তো কতোবার এসব জিনিস দেখেছি। আমি তোমার মতো এসব দিকে প্রথম আসছি, তা তো নয়।'

'মানে?'

'এইসব পাহাড়েই আমার জন্ম, যেমন তোমারও। তারপর আমি মা-বাবার সঙ্গে দক্ষিণদিকে গিয়েছিলাম। অনেক দূর গিয়েছিলাম আমরা। সমুদ্র পর্যন্ত, যেখানে শুধু জল আর জল। উড়েই চলেছি আমরা, উড়েই চলেছি। অবশেষে মাটি দেখা গেলো।'

'কতো উড়েছিলে?'

'এই ধরো, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।'

'এক নাগাড়ে? কোথাও থামোনি?'

'হ্যাঁ, না থেমে। আর থামতামই বা কোথায়? চারিদিকে তো শুধু জল আর জল।'

'তুমি ক্লান্ত হওনি? ভয় করেনি তোমার?' ভোলু তো অবাক।

'প্রথমবার তো খুব ভয় করেছিলো। ক্লান্তও হয়েছিলাম খুব, তবে আমি একা ছিলাম না। শুধু আমার মা-বাবা নয়, আরও কেউ-কেউ ছিলো। ওরা আমাকে লাগাতার উৎসাহ দিচ্ছিল। কিন্তু প্রচন্ড ক্লান্তিতে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। আমার বাবা ভাবছেন কী করা যায়। এমন সময় দেখতে পেলেন কিছু দূরে একটা ছোট্ট দ্বীপ। বাবা আমাকে সেই দ্বীপে নিয়ে গেলেন। অন্য পাখীরাও নেমে এলো। ওখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। সে এক ছোট্ট সুন্দর দ্বীপ, জল কমে যাওয়ার বেরিয়ে এসেছে। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে আর আমাদের তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। আবার আমরা ওড়া শুরু করলাম। অনেক ওড়ার পর মাটি দেখা গেল। সেই নতুন দেশে যখন আমরা নামলাম তখন রাত হয়ে গেছে।'

পাখির গল্পে ভোলু খুব মজা পায়। মাঝে-মাঝে আশ্চর্যও হয়। সে কেমন দেশ যেখানে শুধু জল আর জল? এত জলের কথা সে তো কখনও শোনেনি।

'কিন্তু তোমরা কি করে এত উড়তে পারো? সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত না-থেমে?' ভোলু জিজ্ঞেস করে।

'আরে, আমরা কীই বা এমন উড়ি? আমাদেরই আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে এমন পাখি আছে যারা একনাগাড়ে দিনের পর দিন উড়ে চলে, কোথাও না থেমে, কিছু না খেয়ে।'

কিন্তু কি করে? এ কেমন করে হয়? ভোলুর বিশ্বাস হয় না। বিশেষ করে, না-খেয়ে থাকার কথাটা ও বুঝতেই পারে না।

'কি জানি কি করে! এ-বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না তবে কথাটাতো সত্যি। আসলে আমাদের শরীরের গড়নই এমন। আমরা মাইলের পর মাইল ক্লান্ত না হয়ে উড়ে যাই। আমরা এ'ও বুঝতে পারি কোন ঋতুতে বাতাস কোন দিকে বয়। বাতাসের গতি আমাদের সাহায্য করে। জলে যেমন কাঠের টুকরো ভাসে আমরা তেমনি বাতাসে ভেসে চলি। আমাদের শরীর তো খুব হালকা; হাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে রাখতে পারলেই হল। এমনি করেই উড়ে চলি মাইলের পর মাইল। অবাক



হয়ে ভোলু জিজ্ঞেস করে, 'কেন তোমরা এত উড়ে বেড়াও এদিক-ওদিক? এক জায়গায় মন বসে না বুঝি?'

পাখি বলে,'উড়ে বেড়ানো ভালো। এতে কতো নতুন জিনিস জানা যায়, দেখা যায় ;কতো রকমের খাবার জিনিস পাওয়া যায়। এক জায়গায় বেশি বসে থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসে। এই পৃথিবীতে আমাদের আসা কিসের জন্য, বলো! দেখবার জন্যে, জানবার জন্যে; নয় কি? তাছাড়া শীতকালে এখানে বড়ো ঠান্ডা। দক্ষিণের আবহাওয়া খুব আরামের; তাই উড়ে যাই সেখানে।'

পাখির কথাবার্তা বড়ো সুন্দর, কিন্তু ভোলু বোঝে না ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতে হাজার হাজার মাইল দূরে যাওয়ার কী মানে!

পাখি বলে,'মনে হচ্ছে রামনগর আসছে।'

'তাই না কি?' ভোলু খুশি।

'কত দূর আর?'

'এসে গেল বলে। কথা বলতে বলতে কতদূর চলে এসেছি বুঝতেই পারিনি।' ভোলুকে তাড়াতাড়ি হাঁটতে দেখে পাখি খুশি।

ভোলুও খুব খুশি : 'মনে হচ্ছে বড়ো তাড়াতাড়ি এসে গেলাম।'

'সত্যি খুব তাড়াতাড়ি ; কাল দুপুরে তুমি প্রায় বাড়ি পৌঁছে যাবে।'

পাখি বলে চলে, 'তুমি বলছিলে না আমরা কেন উড়ে উড়ে বেড়াই? কেন এক জায়গায় নিশ্চিন্তে থাকি না? যদি বাড়ি থেকে না বেরুতাম তোমার সঙ্গে দেখা হতো?

দেখা হতো মোটরসাইকেল-চালানো ভোলুর সঙ্গে ? তাহলে এ-রাস্তার খোঁজ তোমাকে কে দিতো ? রাস্তা না জানলে এতদূর নিরাপদে পৌঁছতে ? আর ঘুরে না বেড়ালে কি কিছু জানা যায় ? বুঝলেন, মিস্টার ভোলু ?' পাখি হাসতে থাকে।

হাসি থামলে পাখি বলে, 'আপাতত তুমি এখানেই থাকো। আমি এক নজর দেখে আসি। কাছেই শহর, কাজেই রাস্তা ধ'রে-ধ'রে এখন আর যেতে পারবে ন।'

একটা ঝোপের আড়ালে ভোলু বসে পড়লো। পাখি এগিয়ে গেল। ভোলু ভাবলো, এই সুযোগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক, ফলের থোকায় কয়েকটা ফল এখনও রয়েছে। খাওয়া শেষ হতে-না-হতেই পাখি ফিরে এলো।

'এখানে মনে হয় কোনো ঝামেলা নেই। প্রথম কথা, শহরটা ছোট। তাই অনেক ঘুরতে হবে না। তাছাড়া মনে হচ্ছে সকাল হতে দেরি আছে। একটা লোকও পেলাম না যার ঘুম ভেঙেছে। তাড়াতাড়ি চলো, সকাল হওয়ার আগেই আমরা শহর পেরিয়ে যাব।

ভোলু উঠলো: 'চলো তা হলে। ক'টা ফল রেখেছি তোমার জন্যে, খেয়ে নাও।' ভোলুর ভয়টা এতক্ষণে কমে এসেছে। ওর সেই উৎকণ্ঠার ভাবটা এখন আর নেই।

পাখির খিদে নেই। দিনে খুব খেয়েছে। তাছাড়া ভোলুর আনা কাঁচা ফল ওর ভালো লাগে না, পাকা হলেও নাহয় কথা ছিলো ! তাও ভোলুর মন রাখতে ও একটু খেলো। তারপর রাস্তা মাঠ পার করতে করতে ওরা আবার চললো।



বনের বাতাস

সূর্য উঠতে এখনও দেরি আছে। ভোরের লাল রঙ আস্তে আস্তে ছেয়ে ফেলছে আকাশ। ওরা শেষ শহরও পার হয়ে এসেছে। জঙ্গল শুরু হয়েছে। নদীর পাড় ধ'রে ওরা চলেছে। কাছেই পাহাড়। ভোলু আজ খুব খুশি। চারিদিকে পাখির কিচির-মিচির। একদল হরিণ জল খেয়ে ফিরছে। ভোলু মুগ্ধ হয়ে দেখছে তো দেখছেই। সকালের স্বচ্ছ হাওয়ায় জঙ্গলি গাছের হাল্কা সুগন্ধ। এমন পরিবেশ ও এই প্রথম অনুভব করলো। শহরে তো ডিজেল আর পেট্রোলের গন্ধ ছাড়া কিছুই নেই।

'নবরঙ্গী দিদি, এ কোন নদী?'

এ হল কোশী। চলো নদীতে নামি। তোমার চান করাও দরকার। পরশু থেকে তোমার গায়ে অনেক কাদা লেগেছে। এ অবস্থায় কে তোমাকে চিনবে?

চানে ভোলুর আগ্রহ নেই, কিন্তু কি করে! পাখি এমন কথা বললো! ও চুপচাপ পাখির পেছনে-পেছনে এগোলো।

সকালের আলোয় নদীর জল রূপোর মতো উজ্জ্বল। পাখির হুকুম : 'তাড়াতাড়ি চান করো; তারপর জঙ্গলের ভেতর যেতে হবে।'

কনকনে হাওয়া বইছে। জল দেখেই ভোলুর শীত করতে লাগলো।

নামার আগে জলটা ছুঁয়ে দেখা উচিত, ভোলু ভাবলো। ছুঁতেই মনে হল যেন 'কারেন্ট' লেগেছে। লাফিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়ালো।

পাখি অবাক! 'কি হল?'

'খুব ঠান্ডা! বাপরে বাপ, এতো ঠান্ডা জল! চান করবো কি করে?' ভোলু প্রায় কেঁদে ওঠে।

পাখি তাকালোও না। নাক বন্ধ করে সোজা জলে ডুব দিলো। তিন-চার ডুব দেবার পর ভোলুকে ডেকে বললো, 'খুব ভালো জল। একবার ডুব দিলে শীত পালিয়ে যাবে। এসো, চলে এসো।'

ভোলু এখনও দ্বিধায়। ওর ভয় কিন্তু ভেতরে ভেতরে লজ্জাও পাচ্ছে। আর ও এ-ও জানে যে এড়ানো সম্ভব নয়। পাখি আবার ডাকে, 'এ-ভাবে ভয় পেলে চলবে না। এসো, শিগগির এসো।'

শেষপর্যন্ত ভোলু লাফিয়ে জলে নামলো। ওর ইচ্ছে ছিলো এক ডুব দিয়ে পালিয়ে আসে কিন্তু পাখি খুব সেয়ানা ; ও ভালুককে অনেকক্ষণ আটকে রাখলো।



ভালুক যেই জল থেকে বেরোতে যাবে, পাখি বলে ওঠে, 'কানে ময়লা রয়েছে, ঠিক করে পরিষ্কার করো।' আবার বলে, 'পিঠটা ঘষে নাও, মাটি লেগে আছে।' পিঠ পরিষ্কার হতে না হতে বলে ওঠে। 'এ মা, ঘাড়ের অবস্থা দ্যাখো। আর হ্যাঁ, হাত-পা ভালো করে পরিষ্কার করো। একটা পাথরের টুকরো দিয়ে ঘষে নাও। ময়লার তো একটা পরত পড়ে গেছে। কি বলবে লোকে?'

ভোলুকে খুব চান করতে হল। জল থেকে উঠে এসে ঠান্ডায় ওর যে কি কাঁপুনি।



বাড়ির দিকে

জঙ্গলে ঢুকে পাখি ভোলুকে বললো, 'তুমি আমাকে যতোটুকু হদিশ দিয়েছিল সেই হিসেবে তোমায় এনেছি। নিজের বাড়ি এবার তোমাকে নিজেই খুঁজে নিতে হবে। আমারও তো কাজ আছে। আমার বাচ্চারাও ফিরছে। পৌছতে ওদের বেশি দেরি নেই আর। ওদের থাকার জায়গা খুঁজতে হবে।'

ওর কথা শুনে ভোলুর মন খারাপ হয়ে গেল। ও কিছু বললো না।

ভোলুকে অনেকক্ষণ চুপ দেখে পাখি ওকে উৎসাহ দিয়ে বললো, 'ঘাবড়ে যেও না। আমি তোমাকে এইভাবে ছেড়ে চলে যাব না। কাছেই এক বুড়ো ভালুক থাকে। ওর কাছে তোমায় নিয়ে যাব। ও খুব ভালো, সবাইকে সাহায্য করে। বাড়ি পৌছতে ও তোমাকে আমার চেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারবে।'

বুড়ো ভালুকের বাড়ি কাছেই। চট করে ওরা সেখানে পৌছে গেল।

পাখি ভোলুকে পাহাড়ের মাঝখানে এক গুহায় নিয়ে গেল। বুড়ো ভালুক বাইরেই বসে হাই তুলছিলো।

পাখি বললো, 'সব ভালো তো কাকা? আমাকে চিনতে পারছ? আমি বিদ্দুটি।'

'আরে, তুই এসে গেছিস ? এবার মনে হচ্ছে একটু তাড়াতাড়ি এলি। সফর কেমন কাটলো?

'খুব ভালো। আসলে ওদিকে এবার গরম একটু তাড়াতাড়ি পড়লো। তাই চলে এলাম। তুমি তো জানো পাহাড়ের জন্যে বড়ো মন কেমন করে আমার।'

'তা হবে না? এ যে তোর জন্মভূমি।' বুড়ো ভালুক মাথা নেড়ে - নেড়ে বলে : 'আর সবাই কোথায় রে?'

'আসছে। ওরা সব পেছনে রয়েছে। আমাকে আগে এসে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।'



'যাক, ভালই হল, তুই এসে গিয়েছিস। এবার তোর গান তো শুনতে পাব।'

ভোলু পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দিকে ইশারা করে পাখি বললো, 'আমি আমার সঙ্গে এক বন্ধু এনেছি।'

'কই রে?' বুড়ো ভালুকের চট করে কিছু ঠাহর হয় না। ভোলু দু-পা এগিয়ে এলো। ওকে দেখে বুড়ো বলে, 'আরে ভাই, কিছু মনে করিস না, বুড়ো হয়েছি, চোখে আর অতো ভালো দেখি না। তুই তো ভালুকই মনে হচ্ছে।'

পাখি ভোলুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। 'মনে হচ্ছে নয় কাকা, এ সত্যিই ভালুক। খু কাজের। মানুষের মতো মোটরাসাইকেল চালায়।'

'তুই কোথায় পেলি একে?'

'পাবো আর কোথায়? রাস্তায় বসে কাঁদছিলো।' তারপর যা-যা হয়েছে, সব ব একে-একে। 'কাকা, তুমি কোনো ভালুক পরিবারকে জানো যাদের বাচ্চা হারিয়ে গেছে? এর তো কিছুই মনে নেই। তখন অবশ্য এ খুব ছোট ছিলো। মা-বাবার নাম জানে না।' পাখির গলায় উৎকণ্ঠা।

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। প্রায় এক-দেড় বছর আগে দুজন ভালুক নিজেদের বাচ খুঁজতে এখানে এসেছিলো। পশ্চিমদিকে কোথাও ওদের বাড়ি ছিলো। বলছিলে বেশি দূরে নয়ে।' বুড়ো ভালুক নিজের স্মৃতি হাতড়ালো।

মহা চিন্তায় পড়ে পাখি বললো, 'পেয়ে যাব ওদের বলো!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ পেয়ে যাবি। পাবি না কেন? আমার ছেলেরা রয়েছে না! ওরা সা জঙ্গল তোলপাড় করবে। যে-কোনো উপায়ে এর মা-বাবাকে খুঁজে বার করবে। আ খোকা, আয়, আমার কাছে বস, এটা তোর নিজেরই বাড়ি মনে কর।'

বুড়ো ভোলুকে নিজের পাশে বসায়। 'তোকে তোর বাড়িতে পৌঁছনো এখ আমার দায়িত্ব। বিদঘুটি খুবই বুদ্ধিমতী আর দয়ালু। এ তো মস্ত বড়ো কাজ করেছে তারপর বিদঘুটিকে বললো, 'খুকু তুই যা এবার নিজের কাজে। তোর পরিবারে লোকজন আসছে। ভোলুর বিষয়ে তোকে আর একটুও ভাবতে হবে না। তোর দায়ি শেষ।'

যাবার সময় ভোলুকে বিদায় জানিয়ে পাখি বলে, 'ভোলু, এবার তুই ঠিক জায়গ এসে গিয়েছিস। কাকা তোকে তোর মা-বাবার কাছে পৌঁছে দেবেন। আমি কাছাকাছি থাকবো কোথাও। যখনই সময় পাবো, তোর সঙ্গে দেখা করতে আস এখন যাই তাহলে। আর কিছু কাজ থাকে তো বল।'

ভোলু যেন কিছু বলতে চায়। বলবে কি বলবে না ঠিক বুঝতে পারছে না। প বুঝেছে এ যেন কিছু বলতে চায়। ও বলে, "বলো না, এত ধন্দ কিসের? কি

আমরা যদি একজন আরেকজনের কোনো কাজেই না আসি তাহলে বেঁচে থেকে কী লাভ? তুমি নিশ্চিন্তে বলো।'

অনেকক্ষণ ভোলু কিছু বলতে পারে না। অবশেষে, যেই কিছু বলতে যাবে, ওর ঠোঁট কেঁপে ওঠে, গলা ভারি হয়ে আসে। কোনোরকমে বলে,

'তুমি যখন ফিরবে আমার বন্ধুকে বলে দিতে পারবে কি যে আমি ভালোভাবে নিজের বাড়ি পৌঁছে গেছি?' কথা শেষ না হতে ওর চোখ জলে ভরে যায়।

পাখি জানতে চায় ও কি সেই সার্কাসের ছেলেটির কথা বলছে। ভোলু মাথা নেড়ে বোঝায় যে, হ্যাঁ তাই। কথা বেরোয় না মুখে।

পাখি ওর কাঁধে এসে বসে। বলে, 'কেঁদো না। আমি তো অনেকদিন পরে ফিরবো গরম কাল শেষ হলে। ততোদিন তোমার সার্কাস না-জানি কোথায় চলে যাবে। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। দু-একদিনে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে, আমার বাচ্চারা সব এসে যাবে, তারপর আমার আর কোনো কাজ নেই। চট করে গিয়ে তোমার বন্ধুকে বলে আসব যে তুমি নিজের বাড়ি পৌঁছে গেছ। কথা দিলাম তোমাকে।'

ওর পিঠটা একটু চাপড়ে দিয়ে পাখি উড়ে গেলো। জলভরা চোখে ভোলু ওর দিকে তাকিয়ে রইলো যতোক্ষণ ওকে দেখা যায়।

Printed by : Shagun Offset, New Delhi